রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

সর্বস্তরের সাংগঠনিক কাঠামোকে পরিস্থিতির উপযোগী করে পুনর্নির্মাণ করতে হবে

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, বোর্ড কর্পোরেশন-এর শ্রমিক কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে ৪ জুলাই,

বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী

২০২৫-এর ২ ঘণ্টার কর্মবিরতির কর্মসূচী রাজ্য সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারীদের যৌথ আন্দোলন সংগঠিত করার ক্ষেত্রে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি প্রতিনিয়ত নেতৃত্বদায়ী ভূমিকা প্রতিপালনে দায়বদ্ধ থেকেছে। ২০১১-র পরবর্তীতে তথাকথিত 'পরিবর্তনের সরকারের' সময়কালে শ্রমজীবী মানুষ সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের ওপর যেমন বহুমাত্রিক আক্রমণ নামিয়ে আনা হয়েছে, তেমনি এই বহুমাত্রিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে প্রয়োজন বহুমাত্রিক পথে আন্দোলন সংগ্রামকে পরিচালনা করা। ৪ জুলাই ২০২৫-এর ২ ঘণ্টার 'কর্মবিরতি' কর্মসূচীর পথকে প্রসারিত করেছে বিগত ৭-৯ এপ্রিল, ২০২৫-এর ৫ দফা দাবিতে মহকুমা স্তরে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির নেতৃত্বে যৌথমঞ্চের আহ্বানে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী।

সুপ্রিম কোর্ট নির্ধারিত বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ প্রদান, শূন্যপদে স্বচ্ছতার নিরিখে নিয়োগ, অস্থায়ী কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ, ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশে মহার্ঘভাতার অধিকার হরণের প্রতিবাদে দু'ঘণ্টার 'পেন ডাউন' অত্যন্ত সাফল্যের সাথে প্রতিপালিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী পেনশনার্স সমিতি এই কর্মসূচীকে সফল করতে সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই কর্মসূচী সর্বাত্মক সফল করার লক্ষ্যে সকল সংগঠন ও মঞ্চকে যুক্ত করে বৃহত্তর ঐক্য গঠনের মাধ্যমে এই কর্মসূচী করা হয়। যৌথ সংগ্রামের ইতিবাচক বার্তা আগামী ৯ জুলাই, ২০২৫ সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটের দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজ্য কর্মচারীদের নিজস্ব দাবিতে অনুষ্ঠিত ধর্মঘটে তাঁর প্রতিফলন ঘটবে। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির বিংশতিতম রাজ্য কাউন্সিলের সপ্তম সভায় প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় এই বক্তব্য উপস্থাপন করেন সংগঠনের প্রিয় সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য কাউন্সিলের সপ্তম সভা বিগত ৫-৬ জুলাই, ২০২৫ কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন

দেবব্রত রায়

সংগঠনের সভাপতি মানস দাস ও সহ-সভাপতিদ্বয় নিবেদিতা দাশগুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ সিংহ রায়কে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। সভাপতি কর্তৃক শোকপ্রস্তাব পেশ ও নীরবতা পালনের পরবর্তীতে প্রারম্ভিক প্রস্তাবনায় সাধারণ সম্পাদক আরও বলেন, সর্বশেষ একাদশ কেন্দ্রীয় কমিটির সভা গত ২০ জুন, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। গুরুত্বপূর্ণ এই সভায় গত ২৯ এপ্রিল, ২০২৫ এবং ৯ জুন, ২০২৫ সামাজিক মাধ্যমে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত মতো ধারাবাহিক সংগ্রাম আন্দোলনের পর্যালোচনা ও আশু সাংগঠনিক বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়। বিগত কর্মসূচী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ৭-৯ এপ্রিল '২৫-এর মহকুমা স্তরে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচী ২টি মহকুমা ও ১টি সদর মহকুমা ব্যতীত সর্বত্র যৌথমঞ্চের উদ্যোগে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়। ১৮ এপ্রিল, ২০২৫ কলকাতার অঞ্চল নেতৃত্ব ও সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও যুক্ত সম্পাদকদের নিয়ে সাংগঠনিক অবস্থার পর্যালোচনামূলক সভা হয়। সদস্যভুক্তি গ্রহণে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ২০ এপ্রিল, ২০২৫ রাজ্যের শ্রমজীবীদের প্রতিরোধের ব্রিগেড সমাবেশে যৌথ মঞ্চের কর্মী-নেতৃত্বদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ঘটে। ২৩ এপ্রিল, ২০২৫ অবস্থানরত যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষকদের আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১ মে, ২০২৫ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। ৫ মে, ২০২৫ কেন্দ্রীয়ভাবে ২০ মে সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান কর্মসূচী এন্টালি মার্কেটের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। একইভাবে জেলায় জেলায় স্ট্রাইক নোটিশ প্রদান করা হয়। ১৫ মে, ২০২৫ শ্রমকোড বাতিল, সন্ত্রাসবাদ দমন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার দাবিতে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে সারা রাজ্যে ও কলকাতায় কেন্দ্রীয় মিছিলে অংশগ্রহণ ছিল

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া

কেন্দ্রের মোদী সরকারের শ্রমিক-কৃষক বিরোধী, জনবিরোধী, দেশবিরোধী ও কর্পোরেট তোষণকারী নীতির বিরুদ্ধে গত ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং শিল্প ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশনগুলি। এই ডাকে সাড়া দিয়ে ২৫ কোটিরও বেশি শ্রমিক-কর্মচারী ধর্মঘটকে সফল করতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। খেতখামার থেকে কারখানার গেট, রেলস্টেশন থেকে বন্দর, গ্রাম, মফস্বল, শহর, সর্বত্রই ব্যাপক প্রভাব পড়লো ধর্মঘটের। বিক্ষোভ, প্রতিরোধ, প্রতিবাদী সমাবেশ, রেল ও রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে দেশের সংগঠিত ও অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের প্রতিরোধের সামনে হার মানলো সঙ্ঘ-বিজেপির বিভাজন ও ঘৃণার রাজনীতি এবং কর্পোরেট তোষণকারী মোদী সরকার। শ্রমিকদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ধর্মঘটের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কৃষক, খেতমজুর সহ সমাজের প্রান্তিক অংশের মানুষ। বিভিন্ন অঞ্চলে সরকার ও মালিক পক্ষের যৌথ ষড়যন্ত্রে শ্রমিকদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ওপর হামলা করা হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য মারধর, ধস্তাধস্তি ও গ্রেপ্তারের ঘটনা ঘটেছে। পাল্টা প্রতিরোধ গড়েই ধর্মঘট সফল করার অভিযান চলেছে।

২০১৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কেন্দ্রের মোদী সরকার মুখে 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর বুলি আওড়ে দেশের শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে প্রতারণা করে চলেছে। দেশের চরম সর্বনাশ করে সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলিকে জলের দরে আম্বানি-আদানিদের বেচে দেওয়ার চক্রান্ত করেছে এই সরকার। ন্যূনতম মজুরি, ধর্মঘট ও ইউনিয়ন গঠনের অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য ২৯টি শ্রম আইন বাতিল করে তার জায়গায় ৪টি শ্রম কোড সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পার্লামেন্টে পাশ করানো হয়েছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির সঙ্গে আলোচনা না করেই তা কার্যকারী করা হয়েছে। বাধ্য হয়েই শ্রম কোড বাতিল সহ মোট ১৭ দফা দাবিকে সামনে রেখে এই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলো কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ এবং শিল্প ও ক্ষেত্রভিত্তিক ফেডারেশনগুলি।

খেটে খাওয়া মেহনতী মানুষের এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে দেশজুড়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমেছেন সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষ। এই চিত্র দেশের ইতিহাসে এক বিরল নজির সৃষ্টি করেছে। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির নেতৃবৃন্দ এটাকেই এই ধর্মঘটের সব থেকে উৎসাহব্যঞ্জক উপাদান বলে চিহ্নিত করেছেন। শ্রমিক, কৃষক, খেতমজুর, খুচরো ব্যবসায়ী সহ

● সপ্তম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

বৃহত্তর ঐক্যের নবান্ন অভিযান

বিগত ২৮ জুলাই ২০২৫ দুটি যৌথমঞ্চ সম্মিলিতভাবে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলে নবান্ন অভিযানে শামিল হল। রাজ্য কোষাগার থেকে বেতন ও পেনশন প্রাপ্ত শ্রমিক-কর্মচারী, শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী ও অন্যান্য অংশের কর্মচারী এবং মঞ্চের আন্দোলন দুটিকে পূর্ণ সমর্থন জানায়। সেই প্রেক্ষিতেই সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের ২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানকে পূর্ণ এবং সক্রিয় সমর্থনের কথা ঘোষণা করে যৌথ মঞ্চ এক সাথে সাংবাদিক সম্মেলন করে। সেই অনুযায়ী পুলিশ

অবসরপ্রাপ্তদের যৌথমঞ্চ বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদান, চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের স্থায়ীকরণ সহ নানাবিধ দাবিতে লাগাতার রাস্তাতেই রয়েছে। ধারাবাহিক সংগ্রামের পথে চলতে চলতেই বৃহত্তর ঐক্য অতীতে গড়ে উঠেছে। ২০২৩ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি পেনডাউন কর্মসূচী এবং ১০ মার্চ ধর্মঘটের অভূতপূর্ব সাফল্য এসেছিল যৌথ আন্দোলনের মঞ্চকে বৃহত্তর করার মাধ্যমেই। পরিস্থিতির বাস্তবতা সেদিন যেমন ছিল, বর্তমানেও তা আছে। যৌথমঞ্চের ৪ জুলাই '২৫-এর কর্মবিরতি এবং ৯ জুলাই '২৫ ধর্মঘটের প্রেক্ষাপটেই বৃহত্তর ঐক্য গড়ে উঠেছিল। যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সংগ্রামী যৌথ মঞ্চ অপর যৌথ প্রশাসনের সমস্ত হুমকি বাধা উপেক্ষা করে হাওড়া স্টেশনের ভিতরে এবং ফেরিঘাটের সামনে ব্যাপক কর্মচারী জমায়েত করে দুপুরে নবান্ন অভিমুখে মিছিল শুরু করে। কিন্তু রাজ্য পুলিশ বিশাল ব্যারিকেড করে রেল মিউজিয়ামের কাছে মিছিল আটকে দেয়। আদালতের রায়কে মান্যতা দিয়ে কোনো প্ররোচনায় পা না দিয়ে সেখানেই বসে পড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান চালানো হয়। অবস্থান বিক্ষোভে বক্তব্য রাখেন যৌথমঞ্চের নেতা বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী এবং সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের নেতা ভাস্কর ঘোষ সহ অন্যান্যরা। □

কেন্দ্রীয় রক্তদান কর্মসূচী ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

শনিবার (১২.০৭.২৫) ১২ই জুলাই কমিটির হীরক জয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় পালিত হল একাধিক কর্মসূচী।

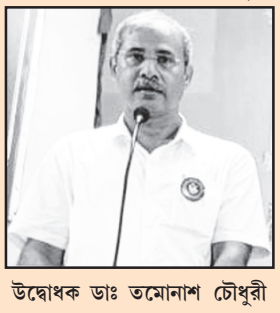

উদ্বোধক ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী

কলকাতায় রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় দপ্তর কর্মচারী ভবনে রক্তদান কর্মসূচী ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের রক্তদান কর্মসূচী ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ও অভয়া মঞ্চের অন্যতম আহ্বায়ক ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন নিউ টাউন নার্সিং হোম-এর প্রতিনিধি দলের সদস্যরা, যাঁদের পরিচালনায় এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজিত হয়। রক্তদান শিবিরে রক্ত সংগ্রহের দায়িত্বে ছিল মানিকতলার সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক। ডাঃ তমোনাশ চৌধুরীকে পুষ্প স্তবক ও স্মারক প্রদান করে সংবর্ধিত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। কর্মচারী ভবনের অরবিন্দ সভা কক্ষে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ, রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায়। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সভাপতি মানস দাস। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী বলেন, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী শ্রমিক-কর্মচারীদের যৌথ সমাবেশের মাধ্যমেই ১২ই জুলাই

স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

কমিটি গঠিত হয় ১৯৬৬ সালের ১২ জুলাই। বিপুল সংখ্যক শ্রমিক, কর্মচারী ও শিক্ষকদের সমাবেশের মধ্যে দিয়ে ৬০ বছর আগে শহীদ মিনার ময়দানে কমরেড অরবিন্দ ঘোষ, কমরেড কে জি বসু, কমরেড সত্যপ্রিয় রায়, কমরেড অনিলা দেবী, কমরেড আশিস সেন প্রমুখ এই কমিটি গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীতে শ্রমিক কর্মচারী শিক্ষক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই সংগঠন। পশ্চিমবাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই যুক্ত মঞ্চ। আর এই দিনটিকে স্মরণে রেখেই বেশ কিছু বছর ধরে ১২ জুলাই রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি কেন্দ্রীয় ভাবে রক্তদান কর্মসূচীর আয়োজন করে আসছে। পূর্বে রক্তদান কর্মসূচীর সাথে দেহদান ও চক্ষুদানের অঙ্গীকার কর্মসূচীও করা হয়েছে। এই বছর বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির অনুষ্ঠিত হয়েছে নিউ টাউন নার্সিং হোম-এর সহযোগিতায়। রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচী শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় ভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নয়, বছর ভর অন্তর্ভুক্ত সমিতিগুলো সহ জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ধারাবাহিকভাবে এই কর্মসূচী রূপায়ণ করে আসছে। সরকারী ব্লাড ব্যাঙ্কগুলিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ রক্ত সঞ্চয় ও বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণে আমরা সবসময় সহযোগিতা করেছি। প্রান্তিক অংশের মানুষ যাতে ব্লাড ব্যাঙ্কগুলো থেকে ধারাবাহিক ভাবে রক্তের যোগান পান তারই জন্য আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। সরকারী প্রতিষ্ঠানকে সুরক্ষিত রাখা ও তার পরিষেবা যাতে সব অংশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায় তার জন্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি দায়বদ্ধ। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী বলেন, আজ এই কর্মসূচীতে আসতে পেরে আমি গর্বিত। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মতো ঐতিহ্যশালী সংগঠন আমাকে এই সুযোগ দেবার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। ৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি সবাইকে অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি রক্তদানের মতো সামাজিক কর্মসূচীকে আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা উল্লেখ করেন। আমরা রক্তপাতের বিরুদ্ধে। আমরা রক্তদানের পক্ষে। আমরা মানুষের সেবায় বিশ্বাসী। আমাদের চেতনার জায়গা থেকেই আমরা এই কাজ করি। যৌথ মঞ্চ, যৌথ আন্দোলন, যৌথ কর্মসূচী করার মধ্যে দিয়ে এই ধরনের বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীর প্রসার ঘটাতে হবে। একদিকে যেমন অনার্জিত দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, অন্যায় বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ, মাঠে ময়দানে, রাস্তা, অফিসে অফিসে দুর্বার আন্দোলন সংগঠিত করা, আবার একই সাথে রক্তদান, চক্ষু ও দেহদানের অঙ্গীকার, স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, পরিবেশ রক্ষায় চারাগাছ বিতরণ ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীর মতো বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচীতে আপনারা সারা বছর যুক্ত রয়েছেন। আপনারা হলেন পথ প্রদর্শক। ধর্মঘটে আপনাদের সাথে পা মেলাতে পেরে আমরা গর্বিত। দেশে কিছু মানুষ আছে যারা

● অষ্টম পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

সংগ্রামী হাতিয়ার
জুলাই ২০২৫
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মুখপত্র
তেপান্নতম বর্ষ □ তৃতীয় সংখ্যা □ মূল্য ঃ ২ টাকা

সম্পাদকীয়

প্রশ্নের সম্মুখীন দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্র

দেশের নির্বাচন কমিশন বিগত ২৪ জুন, ২০২৫ বিহারে ভোটার তালিকার Special Intensive Revision (বিশেষ নিবিড় সংশোধন) বা সংক্ষেপে SIR চালু করার নির্দেশিকা প্রকাশ করে। এই SIR-এর মূল উদ্দেশ্য ভোটার তালিকায় বিদেশী ভোটারদের চিহ্নিত করে তাদের বিযুক্ত করে ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণ। এই নির্দেশিকাকে ঘিরে নানা প্রশ্ন উঠেছে। বিহার রাজ্যকে বেছে নেওয়া, এর সময়কাল, ২২ বছর আগের ভোটার তালিকাকে মানদণ্ড হিসাবে বিচার করা। নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার, সংবিধানগত সীমাবদ্ধতার দিকগুলি—ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে সঙ্গত কারণেই কিছু প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে। ইতিমধ্যে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চে বিচারাধীন। শুনানির সময় সুপ্রিম কোর্টও কিছু প্রশ্ন নির্বাচন কমিশনকে করেছে এবং SIR প্রক্রিয়া চালু করার ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা না দিলেও সুপ্রিম কোর্ট বেঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ কিছু পরামর্শ দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে SIR দেশের নির্বাচনী গণতন্ত্রকেই বড় প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

বিহারে বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ ২২ নভেম্বর, ২০২৫-এ শেষ হবে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তার আগেই সে রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। বিধানসভা নির্বাচনের কয়েক মাস আগে SIR-এর মতো একটি সময়সাপেক্ষ কাজ কি করে করা সম্ভব? যান্ত্রিকভাবে করা সম্ভব যদিও হয়, তাতে ভুলত্রুটি থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। ১ জুলাই, ২০২৫ থেকে এই কাজ শুরু হবে। সংশোধিত প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে ১ আগস্ট, ২০২৫-এ। পূর্ণ তালিকা প্রকাশিত হবে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫। ২৪ জুন থেকে ১ জুলাই কাজ শুরুর আগের মধ্যবর্তী সময়ে ERO-দের প্রতিটি ভোটারদের জন্য নির্দিষ্ট ফর্ম দু'কপি করে তৈরী করে, সব BLO-দের দিতে হবে। BLO-দের ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর BLO-রা প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে নির্দিষ্ট ফর্ম দিয়ে আসবে এবং পরে গিয়ে সেগুলি সংগ্রহ করবে। এর মধ্যে উচ্চতর আধিকারিকরা নির্বাচন কেন্দ্র নির্দিষ্টকরণ করবে। এর সাথে অন্যান্য নানা পদ্ধতিগত কাজ যুক্ত হবে। মাত্র সাতদিন সময় এত বড় কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মোটেই পর্যাপ্ত নয়। প্রান্তিক দরিদ্র মানুষদের একটা অংশ পরিযায়ী শ্রমিক, যারা বাসস্থানে ফিরতে পারবে না। বন্যা ও অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে জন্মের শংসাপত্র সহ অন্যান্য নির্দিষ্ট পরিচিতি পত্র এই অংশের মানুষের নষ্ট হয়ে যায়। ফলত তাদের নাম SIR-এ অন্তর্ভুক্ত হবে না। প্রাথমিক তালিকায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, যার একটা বড় অংশ গরিব মানুষ।

এক বছর আগে বিহারে সাধারণ নির্বাচনের আগে ভোটার তালিকা সংশোধন হয়েছে। সেটা কি তাহলে ত্রুটিপূর্ণ ছিল? আবার ২০০২ সালের ভোটার তালিকাকে মানদণ্ড করা হয়েছে। ২২ বছর আগের ভোটার তালিকা যদি মানদণ্ড হয়, তাহলে মধ্যবর্তী সময়ের নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে বড় প্রশ্ন দেখা দেবে। বলা হয়েছে ২০০৪ সালের পর যাদের নাম তালিকায় যুক্ত হয়েছে তাদের বাবা ও মায়ের যথার্থ প্রামাণ্য দলিল দেখাতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে সচিত্র ভোটার পরিচয় পত্র বা রেশন কার্ড প্রামাণ্য দলিল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্ট এই দুটি প্রমাণপত্রকে গ্রহণ করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে পুনর্বিবেচনা করতে পরামর্শ দিয়েছে।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অভিযোগ SIR-র মধ্য দিয়ে এন আর সি পিছনের দরজা দিয়ে কার্যকর করার চেষ্টা হচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের বক্তব্য, বিহারের ভোটার তালিকায় বিদেশী পাওয়া গেছে। সেই জন্য SIR-এ নাগরিকত্বের প্রমাণ চাওয়া হচ্ছে। ২১ জুলাই '২৫ সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন যে হলফনামা দেয় তাতে SIR কার্যকরী করার যুক্তি হিসাবে যে ত্রুটিগুলির কথা উল্লেখ করা হয় সেগুলি সব সাধারণ ত্রুটি। প্রতিবার নির্বাচনের আগে এই ত্রুটিগুলিই সংশোধন করা হয়। নির্বাচন কমিশন ত্রুটি হিসাবে উল্লেখ করেছে যেমন—ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম থাকা, স্থানান্তরিত ও মৃত ভোটারদের নাম বাদ না পড়া, যোগ্য ভোটার বাদ পড়ে যাওয়া, দু'জায়গায় একই ভোটারের নাম থেকে যাওয়া—ইত্যাদি। হলফনামার ৮০ শতাংশ জুড়ে এই বিষয়ে বক্তব্য রয়েছে। হলফনামায় বাংলাদেশ, মায়নমার সহ অন্য দেশ থেকে অবৈধ অভিবাসীদের রাজ্যের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তির কথা বলা হয়নি। কাজেই ভোটারদের নাগরিকত্ব পরীক্ষার কোনো যৌক্তিকতা নেই। আইনেও এই ধরনের কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। অথচ এর পক্ষেই হলফনামায় জোরালো সওয়াল করেছে নির্বাচন কমিশন। কাজেই এন আর সি ঘুরিয়ে কার্যকর করার আশঙ্কা অমূলক বলা যায় না।

নির্বাচন কমিশনের SIR সংক্রান্ত নির্দেশাবলী এবং কার্যধারা কিছু সাংবিধানিক প্রশ্নের উদ্রেক করছে। নির্বাচন কমিশন নাগরিকত্ব যাচাই করার প্রয়াস নিতে পারে না। এটা তাদের এক্তিয়ার বহির্ভূত কাজ বলে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে। নাগরিকত্ব যাচাই করার ক্ষমতা আছে একমাত্র কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের।

SIR ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (Representation of the people Act, 1950) বা RPA এবং ১৯৬০ সালের Registration of Electors Rules-এর পরিপন্থী। এই দুটি আইন অনুযায়ী প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় নথি না থাকার কারণে যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে, তবে সেক্ষেত্রে ভোটাধিকারের মতো একটি মৌলিক অধিকার লঙ্ঘিত হবে।

সংবিধানের ৩২৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী ১৮ বছরের বেশি বয়সি প্রতিটি নাগরিকের ভোট দেওয়ার অধিকার রয়েছে (মানসিক অক্ষমতা যুক্ত, ফৌজদারী মামলায় দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তি ব্যতীত)। SIR-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের এই অধিকার বাতিল হয়ে যাচ্ছে।

SIR বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে মুসলিম, দলিত, ভূমিহীন কৃষক, শ্রমিক, যাযাবর সম্প্রদায়, মহিলা এবং অন্যান্য দুর্বল গোষ্ঠীগুলির ক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যা তৈরী হচ্ছে। এই পদ্ধতিগত বৈষম্য সংবিধানের ১৫ নম্বর অনুচ্ছেদকে লঙ্ঘন করে। এই অনুচ্ছেদে জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের ভিত্তিতে ভেদাভেদকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন তুলেছে যে, যখন ভোটার তালিকার সামারি রিভিশন হয়, তখন RPA, 1950 অনুযায়ী কোনো ভোটারের নাম বাদ গেলে তা নিয়ে মৌখিক শুনানির ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু SIR-এ এই ধরনের কোনো ব্যবস্থার কথা উল্লেখ নেই। এছাড়াও সর্বোচ্চ আদালত বলেছে যে, RPA, 1950 অনুযায়ী কোনো ভোটারকে বাদ দিতে গেলে তাকে নোটিশ দেওয়ার রীতি আছে। সেক্ষেত্রে ভোটার পর্যাপ্ত সময় ও সুযোগ পায়। SIR-এ সেই সুযোগও নেই।

পরিশেষে বলতে হয় ভারতের নির্বাচন কমিশন শুধু দেশে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও যে সুনাম অর্জন করেছিল, নরেন্দ্র মোদীর সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ধীরে ধীরে তা লোপ পেতে চলেছে। নিরপেক্ষতার নিরিখে নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে এই সরকার। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সহ অন্য কমিশনারদের নির্বাচিত করার সার্চ কমিটিতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির প্রাধান্য বৃদ্ধি করা হয়েছে আইন পরিবর্তন করে। এই সরকারের আমলে ইলেক্টোরাল বন্ড চালু করার মধ্য দিয়ে নির্বাচনে কর্পোরেটদের আধিপত্য বৃদ্ধি, ইভিএম নিয়ে নানা প্রশ্ন, রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহের নিয়মাবলীর নেতিবাচক সংশোধন সহ একাধিক বিষয়কে কেন্দ্র করে নির্বাচনী রাজনীতি এবং নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে মানুষের মনে এই সংস্থা সম্বন্ধে সন্দেহের বাতাবরণ তৈরী করেছে। SIR-কেও জনগণ সন্দেহের চোখে দেখছে সে কারণেই। মহারাষ্ট্রে গত লোকসভা ও বিধানসভা ভোটের মধ্যে ব্যবধান ছিল পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসে ৩৯ লক্ষ নতুন ভোটার যুক্ত হয়েছে সেই রাজ্যের ভোটার তালিকায়। কীভাবে এটা ঘটল সেটা নিয়ে যদি মহারাষ্ট্রে SIR হতো তাহলে হয়তো এত প্রশ্ন আসত না। আমাদের দাবি নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতার সাথে কাজ করুক। □

৩০ জুলাই, ২০২৫

শোক সংবাদ

ভি. এস অচ্যুতানন্দন

শতবর্ষ পেরিয়ে থামল যাত্রা। গত ২১.০৭.২০২৫ সোমবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ১০১ বছর বয়সে কেরালার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী, কেরালার 'ফিদেল কাস্ত্রো' ভেলিক্কাথু শঙ্করন অচ্যুতানন্দন প্রয়াত হলেন। তিনি জাতীয় ও রাজ্য রাজনীতিতে 'ভি.এস' নামেই পরিচিত ছিলেন। নবীন প্রজন্মের কাছে ভি. এস এক 'রূপকথার' নাম, বাকি অনেকের কাছে তিনি নিজে একটি প্রতিষ্ঠান যাঁর প্রতি সাধারণ মানুষের ছিল অগাধ ভরসা-আস্থা। তাঁদের কাছে তিনি 'অচ্যুতানন্দন', তখন তিনি আগুন-ঝরানো রাজনীতিক নন, দলীয় সংগঠকও নন, তিনি তাঁদের 'কাছের মানুষ'---যাঁদের বিপদে-আপদে তিনি আছেন। তিনি কেবলমাত্র সমাজবদলের নেতৃত্ব বা কেরালার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে পরিচিত নন, বাল্যকাল থেকে তিনি ছিলেন একজন উপযুক্ত যোদ্ধা। কিশোর বয়সে যোগদান করেছিলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে, কেরালার সুপারি ও নারকেলের ছোবড়াকে কেন্দ্র করে গঠিত শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রমিকদের সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে নিজেকে একজন প্রতিষ্ঠিত নেতৃত্ব হিসাবে পরিচিত করাতে পেরেছিলেন।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক স্বাধীনতার হাত ধরে প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জনের জন্য লড়াই সংগ্রাম অবিরাম করে গেছেন।

১৯২৩ সালের ২০ অক্টোবর অতি সাধারণ পরিবারে ভি. এস-এর জন্ম। মা আকাম্মাকে চার বছর বয়সে হারানোর পর এবং ১১ বছর বয়সে বাবা শঙ্করনের মৃত্যুর পর সপ্তম শ্রেণীতে পাঠরত অচ্যুতানন্দনের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে দাদা গঙ্গাধরনের টেলারিং-এর দোকানে কাজ করতে থাকেন। সেখানে বিকালের দিকে বসত রাজনৈতিক আড্ডা। তিনিও তাঁদের সাথে আড্ডা দিতেন। তার বছর কয়েকের মধ্যে তিনি সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন মাত্র ১৭ বছর বয়সে। শ্রমিক কৃষকদের অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে প্রথম সারিতে থেকে লড়েছেন। পুলিশের নির্মম অত্যাচার সহ্য করেছেন, মহিলাদের অধিকারের প্রশ্নে সবসময় আপসহীন থেকেছেন।

জরুরি অবস্থার সময়ে ২১ মাস জেলখাটা অচ্যুতানন্দন হচ্ছেন সেই নেতা, যিনি প্রতি পদে লড়াই করে শুধু আসেননি, ফরম্যাল এডুকেশন না থাকলেও সাধারণের মন বুঝে নেতৃত্ব দিতে সক্ষম তা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের জীবনে নানা ধাপে ভি.এস-কে তৃণমূল স্তরের কর্মীদের সংগঠক থেকে ইলেকশন ম্যানেজার, বিপ্লবী হিসাবে আত্মগোপনে থেকে সিভিল সোসাইটির বিবেক হয়ে ওঠা সফল ক্রাউড পুলার থেকে দুর্নীতি-বিরোধী ক্রুসেডার, গ্রীন মুভমেন্ট থেকে জনস্বার্থ মামলাকারী রূপে দেখা গিয়েছে।

স্বাধীনতার ঠিক আগে কেরলে পুন্নাপ্রা-ভায়লারের কৃষক অভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা ছিলেন ভি.এস। সংগঠক হিসাবে নিবেদিত প্রাণ, প্রশাসক হিসাবে দক্ষ 'ভি. এসে'র গোটা জীবনই এক বিশাল অনুপ্রেরণা ও শিক্ষা সংগ্রহশালা।

১৯৬৫ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ১০ বার নির্বাচনে (ভারতের দক্ষিণে কেরল রাজ্যে) প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাত বার জয়ী এবং তিন বার পরাজিত হন। ১৯৬৫-তে প্রথমবার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তিনি পরাজিত হন। শেষ বার ২০১৬ সালে তিনি মালমপুড়া কেন্দ্র থেকে ২৭,১৪২ ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৬৭, ১৯৭০, ১৯৯১, ২০০১, ২০০৬, ২০১১ এবং ২০১৬-তেও তিনি জয় পেয়েছিলেন। দুই পর্যায়ে ছিলেন বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা এবং ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত সামলেছেন কেরালার মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব।

মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে ভি.এস অচ্যুতানন্দন তাঁর সময়ে মুন্নারে অবৈধভাবে দখলে থাকা একরের পর একর জমি উদ্ধার করেছিলেন। তিনি সিনেমা শিল্পে পাইরেসি বিরোধী অভিযান চালু করেন এবং লটারি মাফিয়ার বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু করান মুখ্যমন্ত্রী অচ্যুতানন্দন। ওই একই সময়ে বিপ্লব ঘটিয়ে ভি.এস-এর সরকার কেরালায় বিশেষ করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিনামূল্যে সফটওয়্যার প্রদান কর্মসূচীর উপর জোর দেয়। তিনি ছিলেন লৌহকঠিন মানসিকতার আপসহীন নেতা। তাঁর সাদাসিধে জীবনযাপন এবং সামাজিক ন্যায়ের লক্ষ্যে অটল অঙ্গীকার সর্বজনবিদিত। কেরালার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ছাপ রেখেছেন। ২০১৬ সালে কেরলে এল ডি এফ সরকারের 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিশন'-এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বও পালন করেছিলেন।

আলপুঝায় বালিয়া চুড়ুকারে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

ভি.এস অচ্যুতানন্দনের প্রয়াণে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও বিশিষ্ট জনেরা।

মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও কন্যা বর্তমান। বিদায় 'ভি.এস'। আপনার দেখানো পথ আমাদেরও পথ হবে। □

সুকান্ত চৌধুরী

আজিজুল হক

২১ জুলাই, ২০২৫ সমাপ্ত এক লাল টুকটুকে অধ্যায়ের; ''ছুটন্ত সময়ে ফুটন্ত মানুষের কারিগর'' প্রবীণ বামপন্থী চিন্তক, প্রাবন্ধিক, কবি আজিজুল হক প্রয়াত হন সল্টলেকের এক বেসরকারী হাসপাতালে। বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার সঙ্গে লড়ছিলেন। বাড়িতে পড়ে গিয়ে হাত ভেঙে যাওয়ার পর থেকেই শারীরিক পরিস্থিতি ক্রমশই খারাপের দিকে যেতে থাকে। ভেন্টিলেশন সাপোর্টে দিন কেটেছে, শরীরের রক্ত সংক্রমণ ধরা পড়ে মারাত্মকভাবে। একের পর এক জটিলতা কাটিয়ে ওঠার লড়াই চলছিল, কিন্তু শেষরক্ষা আর হল না। ২১.০৭.২৫ দুপুরে প্রয়াত হন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সমাজের বামপন্থী নেতৃত্ব সহ বিশিষ্ট জনেরা।

আজিজুল হকের জন্ম ১৯৪২ সালে হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া মহকুমার রণমহল গ্রামের এক জমিদার পরিবারে। কলকাতায় পড়াশোনা করতে এসে বামপন্থী মতাদর্শে বিশ্বাসী হন এবং বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হন। ছাত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়েই তিনি কৃষক আন্দোলন, খাদ্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। সাতের দশকে (১৯৭০ সালে) ব্যাপক পুলিশি ধরপাকড়ের মধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তাঁর জীবনের একটি বড় অংশ কেটেছে জেলে। নানা অভিযোগে, যার মধ্যে বিতর্কিত হত্যাকাণ্ডও রয়েছে। ১৯৭৭ সালে মুক্তি পেলেও ১৯৮২ সালে আবার গ্রেপ্তার হন। নকশালবাড়ি আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন আজিজুল হক। ভারতের সেই সময়ের বামপন্থী রাজনৈতিক মানচিত্রের এক উল্লেখযোগ্য নাম।

সরাসরি রাজনীতি থেকে অনেকদিন আগেই সরে এসেছিলেন তিনি। কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ভাষা শহীদ স্মারক সমিতি। বিভিন্ন দৈনিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষণমূলক লেখা লিখেছেন তিনি। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে রয়েছে ''লাল টুকটুকে দিন'', ''হায়না মানুষ'', ''ছুটন্ত সময় ফুটন্ত মানুষ'', ''হাতির খোঁজে রাজা'', ''মনু মহম্মদ হিটলার'', ''কারাগারে ১৮ বছর'' প্রভৃতি। তাঁর প্রস্থান একটি যুগের অবসান। তিনি শুধু একজন প্রাবন্ধিক বা রাজনৈতিক কর্মী নন, তিনি ছিলেন এক ঐতিহাসিক সময়ের জীবন্ত দলিল। নকশাল আন্দোলন থেকে শুরু করে জেল জীবনের অভিজ্ঞতা কত কিছুই তাঁর চিন্তা ও লেখায় প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবাদ, সহ্যশক্তি এবং আদর্শের প্রতি অটল বিশ্বাসই তাঁকে আলাদা করে তুলেছিল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত কলম চালিয়ে গেছেন, লড়াই চালিয়ে গেছেন। তাঁর মৃত্যু শুধুমাত্র একটি ব্যক্তির অন্তর্ধান নয়, এক সংগ্রামী চেতনার অবসান। তবু তাঁর লেখা, তাঁর আদর্শ, আর স্মৃতি বেঁচে থাকবে আগামী প্রজন্মের জন্য। চিন্তায়, চেতনায় ও আদর্শে আজীবন ছিলেন আপসহীন। তাঁর মৃত্যু যেন এক রাজনৈতিক চেতনার অবসান, যেখানে আদর্শের জন্য জীবন বাজি রাখাই ছিল মূল পরিচয়। তিনি বলতেন স্রোতের বিরুদ্ধে হাঁটাই বামপন্থা। সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেও বামপন্থী চেতনা বহন করেছেন আমৃত্যু পর্যন্ত।

প্রয়াত আজিজুল হক 'গণদর্পণ' সংস্থার মাধ্যমে মরণোত্তর দেহ ও চক্ষু দানের অঙ্গীকার করে গিয়েছিলেন। সেই অনুযায়ী একটি বেসরকারী আই ব্যাঙ্কের উদ্যোগে সংগৃহীত কর্ণিয়া দুটি প্রতিস্থাপনের জন্য হস্তান্তর করা হয় এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণার স্বার্থে কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যানাটমি বিভাগে তাঁর দেহ তুলে দেওয়া হয়।

প্রয়াত আজিজুল হকের স্ত্রী মণিদীপা ও কন্যা অগ্নিহোত্রী বর্তমান।

রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি (কেন্দ্রীয় কমিটি) তাঁর পরিবার, তাঁর গুণগ্রাহী ও তাঁর সহযোদ্ধাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানায়। □

সুকান্ত চৌধুরী

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০ বছর ও বর্তমান সময়

বিদ্যুত দাস

৯ মে, ২০২৫ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০ বছর পালিত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। ১৯৪৫ সালে ৯ মে মিত্র শক্তি ও সোভিয়েত সেনাবাহিনীর কাছে ফ্যাসিস্ট জার্মানি নিঃশর্তে আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। প্রায় ৫ কোটি জীবনের বিনিময়ে (শুধু সোভিয়েত ইউনিয়নেরই ২ কোটি ৭০ লক্ষের বেশি প্রাণ দিয়েছেন এবং ১ কোটি ২০ লক্ষ মানুষ পঙ্গু হয়েছেন) ফ্যাসিস্ত শক্তির পরাজয়ের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বাধীনতা সংগ্রামের গতি বৃদ্ধি পায়। ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। চীনের মুক্তি যুদ্ধ সফল হয়। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়কে স্মরণ করে সম্প্রতি ফ্যাসিবাদ বিরোধী ফোরামের দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে মস্কোতে। বিশ্বের ৯১টি দেশের ১৬৪ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, এই সম্মেলনের আহ্বান ছিল—''নানা আঙ্গিকে মাথা চাড়া দিচ্ছে ফ্যাসিবাদ, তাকে প্রতিহত করতে হবে ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়েই''।

৯ মে, ২০২৫ মস্কোর রেড স্কোয়ারে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আমন্ত্রিত থাকা সত্ত্বেও যাননি। বিজয় দিবসের ৭৫ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানেও প্রধানমন্ত্রী অনুপস্থিত ছিলেন। দীর্ঘদিন যাবৎ মস্কোয় বিজয় দিবস উৎযাপিত হয় সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া দখলদারির বিরুদ্ধে উন্নয়নশীল দেশগুলির একজোট হওয়ার মঞ্চ রূপে।

ফ্যাসিবাদ কী?

ফ্যাসিজম বা ফ্যাসিবাদ শব্দটি এসেছিল ইতালীয় শব্দ 'ফ্যাসিসকো' থেকে। এর অর্থ বান্ডিল বা গোছা। কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা বোঝাতে প্রাচীন রোমে এক গোছা লোহার দণ্ডকে জড়িয়ে বাঁধা হতো একটি কুঠারের গায়ে।

ফ্যাসিসকো শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন ১৯১৯ সালে মুসোলিনী। তাঁর দলের প্রতীক ছিল লৌহ দণ্ড সজ্জিত কুঠার।

১৯২২-এর অক্টোবরে ফ্যাসিবাদের প্রথম উদ্ভব হয় ইতালিতে, যদিও ফ্যাসিবাদের একেবারে প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিয়েছিল ফিনল্যান্ড, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, জার্মানিতে। ১৯৩৩-এ জার্মানিতে নাৎসিদের ক্ষমতা দখলের মধ্যে দিয়ে ইউরোপে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

জর্জি ডিমিট্রভ ফ্যাসিবাদের সংজ্ঞায় বলেন, ''ফ্যাসিবাদ হল লগ্নি (ফিনান্স) পুঁজির সবচাইতে প্রতিক্রিয়াশীল, সবচাইতে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অংশের সর্বাধিক প্রকাশ্য সন্ত্রাসবাদী একনায়কত্ব।'' তিনি আরো বলেন ''ফ্যাসিবাদ হচ্ছে লগ্নিপুঁজিরই ক্ষমতা। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক সমাজ ও বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী অংশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী প্রতিহিংসা নেবার সংগঠন।''

যদিও ইতালির ফ্যাসিবাদ এবং জার্মানির ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদ একইরকম ছিল না। কিন্তু ফ্যাসিবাদের কতগুলি অভিন্ন চরিত্র বা লক্ষণ আছে। এই লক্ষণগুলি চিহ্নিত করে ১৯৩৫ সালে কমিন্টানের সপ্তম কংগ্রেসে জর্জি ডিমিট্রভ বলেছিলেন, ''ফ্যাসিবাদ শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে মারাত্মক শত্রু। ফ্যাসিবাদ বিষাক্ত প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লব। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে বেপরোয়া উগ্র জাত্যাভিমান এবং পররাজ্যগ্রাসী যুদ্ধ। ফ্যাসিবাদ হল শ্রমজীবী জনতার উপর পুঁজির সবচেয়ে হিংস্র আক্রমণ।''

পুঁজিবাদী সঙ্কট মোকাবিলায় ফ্যাসিবাদী পথ ঃ

উনবিংশ শতকে পুঁজিবাদের সঙ্কট তিনটি পর্যায়ে হয়েছিল। প্রথম ১৯২৩ থেকে ১৯২৪, দ্বিতীয় ১৯২৪ থেকে ১৯২৯ এবং তৃতীয় পর্যায় ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩। এই সময়ে ক্রমশ গভীর সঙ্কটে প্রবেশ করে পুঁজিবাদ। ফলস্বরূপ বিশ্বে মহামন্দা দেখা দেয়।

১৯২৩-১৯৩৩ এই এক দশকের বেশি সময়ে পুঁজিবাদী বিশ্বে উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ ও প্রচলিত উৎপাদন সঙ্কটের মধ্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতা অনেক গুণ বেড়েছিল। অনাহার, বেকারি (৫ কোটি) বৃদ্ধি, শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি হ্রাস, মুদ্রাস্ফীতি, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, আভ্যন্তরীণ বাজার সংকুচিত হয়।

১৯১৭ সালে প্রকাশিত হয় লেনিনের বিখ্যাত রচনা ''সাম্রাজ্যবাদ ঃ পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর''। এই গ্রন্থে লেনিন দেখান কীভাবে পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদে রূপান্তরিত হয়েছে এবং আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য এবং উপনিবেশের জন্য বিশ্ব পুনর্বণ্টনের চেষ্টার ফল।

লেনিনের নেতৃত্বে সফল নভেম্বর বিপ্লবের প্রভাবে পৃথিবীর ছয় ভাগের এক ভাগ অংশ পুঁজিবাদের হাতছাড়া হয়।

এই সময় আর্থিক সঙ্কট বৃদ্ধি এবং বিভিন্ন দেশে সর্বহারা বিপ্লব মোকাবিলায় পুঁজিবাদ বিভিন্ন অস্ত্র প্রয়োগ করে। যেমন রাশিয়ায় সশস্ত্র প্রতিবিপ্লব করার চেষ্টা করা, সর্বহারা বিপ্লবে অন্তর্ঘাত সংগঠিত করা এবং মার্কিন ত্রাণ, খাদ্য সাহায্য এবং ঋণ দিয়ে পূর্ব ইউরোপে অবস্থা সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা। কিন্তু পুঁজিবাদের এই অস্ত্রগুলি অচিরেই অকার্যকর হয়ে পড়ে। পুঁজিবাদী সঙ্কট আমেরিকা সহ পুঁজিবাদী দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। মার্কিনী পুঁজিবাদ সঙ্কটমুক্ত বলে প্রচার চালানো হয়।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্সের তত্ত্বকে স্বনির্ভর হিসাবে তুলে ধরা হয়। জার্মান সমাজতাত্ত্বিক কার্ল কাউটস্কির 'অতি সাম্রাজ্যবাদ'-এর তত্ত্বও প্রচার করা হয়। যদিও ১৯২৯ থেকে চলা মহামন্দা মোকাবিলায় কিছু ব্যর্থ প্রয়াসও জারি ছিল। যেমন অতি উৎপাদনের সঙ্কট মোকাবিলায় উৎপাদিত সামগ্রী ধ্বংস করা এবং মূল্যস্তর চড়া রাখার পথ গ্রহণ করে। যন্ত্র ব্যবহারের বিরোধিতা করা, বই পোড়ানো উৎসব করা, বিজ্ঞান প্রযুক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা, ইহুদি বিদ্বেষ ও আর্যজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করা, 'জাতীয় স্বনির্ভরতা', জাতীয় প্রতিরক্ষা ইত্যাদি শ্লোগানের মাধ্যমে বিশ্বের বাজার দখল করার প্রচেষ্টা চালানো। শুল্কের প্রাচীর তোলা হল, সারচার্জ, খরচে নিষেধাজ্ঞা লাগু করা, মুদ্রা বিনিময়ে নিয়ন্ত্রণ আনা, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক যুদ্ধ ঘোষণা করা, একে অপরকে দোষারোপ করতে থাকে এবং বিশ্ব পুঁজিবাদী অর্থনীতির সামরিকীকরণের বিকাশ ঘটে। এ সবের পরিণতিতে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে এবং ফিনান্স পুঁজির সবচাইতে প্রকাশ্য সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্বের প্রকাশ ঘটে।

বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদের প্রকাশ ঃ

ইতালিতে প্রথম ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। কারণ সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সংস্কারবাদীরা বৈপ্লবিক গণজাগরণ ভেঙে দেয় এবং মুসোলিনী এই পরিস্থিতি ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করে। মুসোলিনী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করে। বিপ্লবীদের কারাবন্দী করে, হত্যা করে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে ১৯২৩ সালে।

ভার্সাই চুক্তির মধ্যে দিয়ে (২৮ জুন, ১৯১৯) জার্মানির মধ্যে প্রতিহিংসা ও উগ্র জাত্যাভিমান গড়ে উঠতে থাকে এবং উগ্র দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ফ্যাসিস্ত একনায়কত্ব গড়ে তোলার বীজ বপন করেছিল, একই সঙ্গে এসেছিল বিপ্লবের জোয়ার। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলেরও চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বহু নেতা ও কর্মীদের রক্তের বন্যা সত্ত্বেও বিপ্লব ব্যর্থ হল। এই বিপর্যয়ও পরবর্তীকালে জার্মানিতে ফ্যাসিবাদের বীজ বুনেছিল। আর্থিক সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে শিল্পপতিরা হিটলারকে সমর্থন করে। ৩০ জানুয়ারি, ১৯৩৩ হিটলার জার্মানির চ্যান্সেলার হন। ১ মার্চ, ১৯৩৩ নাৎসিরা রাইখস্ট্যাগে অগ্নিসংযোগের দায় চাপিয়ে দেয় কমিউনিস্টদের উপর। হিটলারের নাৎসি একনায়কত্বে ইহুদিদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া হয় এবং লক্ষ লক্ষ ইহুদিদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে হত্যা করা হয় এবং বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে নিষিদ্ধ করা হয়।

১৯৩৬ সালে স্পেনে গণআন্দোলনকে গুঁড়িয়ে দিতে ইতালি ও জার্মানির সাহায্যে জেনারেল ফ্রাঙ্কো একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৬ সালে পর্তুগালে সালাজার সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করে। ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদী সঙ্কটের প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ত শক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৩৪ সালে ফ্যাসিস্ত বাহিনী পার্লামেন্ট দখল করার উদ্যোগ নিলে কমিউনিস্টরা প্রতিরোধ করে, সঙ্গে ছিল ফ্যাসিবিরোধী মানুষ। যদিও ফ্রান্সের বুর্জোয়া সরকার ফ্যাসিস্তদের সঙ্গে আপস করলেও শেষপর্যন্ত ফ্যাসিস্তরা ক্ষমতা দখল করতে পারেনি।

১৯৩৬ সালে অস্ট্রিয়াতে ফ্যাসিবাদের সূচনা হয়। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের সাম্রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষার ফলে আন্তসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব তীব্র হয়। বিশ্বের বাজার দখল ও সম্পদের ভাগাভাগির সংঘাতে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে একদিকে ছিল জার্মানি, ইতালি, জাপান অন্যদিকে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, আমেরিকা। ১৪ই জুন ১৯৪০ নাৎসিরা প্যারিস দখল করে।

১৯৪১ সালে ২২ জুন জার্মানি অনাক্রমণ চুক্তি ভঙ্গ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ (অপারেশন বারবারোসা) করে। তার আগেই ইউরোপের প্রায় পুরোটাই দখল করে নিয়েছিল হিটলার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে পরিণত হয়। বিরোধী জোটের দেশগুলি ছিল (মিত্র শক্তি) সোভিয়েত ইউনিয়ন, আমেরিকা, ইংল্যান্ড, চীন, ফ্রান্স। এই মিত্র শক্তিগুলি সম্মিলিতভাবে নাৎসি জার্মানি, ফ্যাসিস্ট ইতালি এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়।

ফ্যাসিবাদ বিরোধী যুদ্ধে স্তালিনের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের লাল ফৌজ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সোভিয়েত ভূখণ্ডে নাৎসিদের তিনটি যুদ্ধে পরাজয় ঘটে। মস্কোর যুদ্ধে, স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধে এবং লেনিনগ্রাদের যুদ্ধে (সেন্ট পিটার্সবার্গ)। এই যুদ্ধে সোভিয়েতকে এককভাবে লড়তে হয়েছিল জার্মানি ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে। কারণ মিত্রশক্তির বাকি দেশগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাজয়ের জন্য অপেক্ষা করছিল। স্তালিন বার বার ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার প্রস্তাব দিলেও ব্রিটেন, আমেরিকা কর্ণপাত করেনি। অবশেষে ১৯৪৪-এর ৬ জুন ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী উত্তর ফ্রান্সের নরমান্ডিতে নামে। যদিও হিটলার সোভিয়েত ইউনিয়নকেই প্রধান 'শত্রু' চিহ্নিত করেছিলেন। লাল ফৌজ যখন বার্লিন ঘিরে ফেলেছে তখনও হিটলার চাইছিল কোনোভাবে সোভিয়েতকে এড়িয়ে ব্রিটিশ বা আমেরিকার সাথে আলাদা বোঝাপড়া করতে। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ৩০ এপ্রিল, ১৯৪৫ লাল ফৌজ জার্মানির রাইখস্টাগ ভবনের মাথায় লাল পতাকা উড়িয়ে দেয়। ঐদিনই হিটলার ও তাঁর প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস সপরিবারে আত্মহত্যা করে। যদিও তার দুইদিন আগে মুসোলিনীকে গুলি করে হত্যা করে মিত্রবাহিনী।

৯ মে, ১৯৪৫ মিত্র বাহিনীর কাছে নাৎসি জার্মান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেন। ফ্যাসিস্ত তাণ্ডব থেকে মুক্তি পেয়ে বিশ্ব নতুন সভ্যতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজে পায়।

ফ্যাসিবাদের পরাজয়ের পরে ইউরোপের অনেকগুলি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে অনেকগুলি দেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। চীনে নয়া গণতন্ত্র সফল হয় এবং সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হয়। সমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ শিবিরে পৃথিবী বিভক্ত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের নেতা হয় আমেরিকা। আমেরিকান ডলার বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরও ফ্যাসিবাদের বিপদ লক্ষ করা গেছে বিভিন্ন দেশে। যেমন মধ্য ষাটের দশকে (৩০.৯.১৯৬৫) ফ্যাসিস্ত অভ্যুত্থান ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ায়, চিলিতে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেছিল সাতের দশকে (১১.৯.১৯৭৩)। সমাজতন্ত্রের বিপর্যয়ের পর গত প্রায় সাড়ে তিন দশকে পুঁজিবাদের সঙ্কট নিরসনে আমেরিকার নেতৃত্বে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী শিবির বেপরোয়া অভিযান চালাচ্ছে।

২০০৮ সাল থেকে চলে আসা আর্থিক মন্দা কাটিয়ে উঠতে পারছে না ধনতান্ত্রিক বিশ্ব। উত্থান ঘটছে নিও ফ্যাসিজমের। ইউরোপ সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নয়া ফ্যাসিবাদের উত্থানের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ করা যাচ্ছে। যেমন, আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজি নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বিশ্বব্যাপী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, নির্বিচারে প্রাকৃতিক সম্পদের দখল নিচ্ছে পুঁজিবাদ। নয়া উদারনীতির ফলে লাভবান হওয়া মধ্যবিত্তের একাংশ এখন সঙ্কটে পড়েছে।

ট্রাম্প দ্বিতীয়বার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এক ধরনের নতুন ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ঘটে। যাকে 'ট্রাম্পিজিম' বলা হচ্ছে। ট্রাম্পিজিম-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল, 'আমেরিকা ফার্স্ট' নীতি কার্যকর করা, অভিবাসনবিরোধী অবস্থান গ্রহণ করা, আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থাকে অগ্রাহ্য করা, বর্ণ, ধর্ম ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ভিত্তিতে বিভাজন ও উত্তেজনা তৈরী করা, ভুল তথ্য ছড়ানো ও মূলধারার মিডিয়ার বিরোধিতা করা প্রভৃতি। ট্রাম্পিজিম আজ এক আন্তর্জাতিক প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। ইউরোপ, ভারত, বাংলাদেশের কিছু রাজনৈতিক কৌশলেও এই মতবাদের ছায়া দেখা যায়।

নয়া উদারবাদের কালপর্বে ভারতে ২০১৪ সালের পরবর্তী সময়কাল থেকে হিন্দু মৌলবাদের আড়ালে নয়া ফ্যাসিবাদী প্রবণতাসম্পন্ন শক্তিগুলি সংগঠিত হতে শুরু করে। আর এস এস ও তাদের হিন্দুত্বের মতাদর্শ ভারতে নয়া ফ্যাসিবাদের নির্দিষ্ট চেহারা দিচ্ছে। আর এস এস নিয়ন্ত্রিত বিজেপি বিগত লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও হিন্দুত্ব-কর্পোরেট আঁতাতের মধ্যে দিয়ে নয়া ফ্যাসিবাদের অভিমুখে চলছে। তিনদিক থেকে নয়া ফ্যাসিবাদী বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠছে। প্রথমত আধিপত্যবাদী ও রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ হিসাবে হিন্দুত্বের মতাদর্শ কায়েমের চেষ্টা, দ্বিতীয়ত নয়া উদারবাদী আক্রমণ চালিয়ে যাওয়া যার মধ্যে দিয়ে ধনীদের শাসনতন্ত্র (প্লুটোক্রেসি) প্রতিষ্ঠা করা এবং তৃতীয়ত বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষায় কর্তৃত্ববাদী আগ্রাসন চালিয়ে যাওয়া। গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দখল করা, নির্বাচন কমিশন দখলের চেষ্টা, ইউ এ পি এ, পি এম এল এ, বি এন এস, শ্রমকোড প্রভৃতি আইনগুলি বিরোধীদের উপর প্রয়োগ করা, মিডিয়ার দখল নেওয়া, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিশানা করে উগ্র জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করা ইত্যাদি। এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে হিন্দুত্ব-কর্পোরেট কর্তৃত্ববাদ ভারতে রাষ্ট্রের ভিতরে সক্রিয় থেকেই রাষ্ট্র কাঠামোর বদল আনতে চাইছে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় শ্রমজীবী সব অংশের মানুষের বৃহত্তর ঐক্য গড়ে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। □

প্রসঙ্গ ঃ সর্বোচ্চ আদালতের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ রায়

মানস কুমার বড়ুয়া

ভারতের সংবিধানের মূলনীতি অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সংবিধানের এই মূল নীতির কাঠামোর উপর কোনো আঘাত এলে বা এই বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উঠলে তা বিবেচনা করে সঠিক পদক্ষেপ নেবার অধিকারী ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্ট। ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা বা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কেমন রূপ নেবে তা সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু এই বিষয়ে দ্বন্দ্বও আছে নানারকম। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রকৃত রূপ হল রাষ্ট্র কোনও ধরনের ধর্মীয় বিষয়ে বা কোনও ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করবে না। আমাদের দেশের বর্তমান শাসক বিজেপি-আরএসএস এই ব্যাখ্যা মানে না। ধর্মনিরপেক্ষতার এই ব্যাখ্যাকে চ্যালেঞ্জ করছে আমাদের রাজ্যের শাসকদলও। তেমনি গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ নিয়েও নানা ধরনের মত আছে। এই দ্বন্দ্বের একটি অন্যতম প্রধান উৎসস্থল হল নির্বাচিত সংস্থা এবং সাংবিধানিক সংস্থা বা তার প্রধানদের ক্ষমতার সাংবিধানিক সীমানা কতটা হবে তা নিয়ে। সাংবিধানিক প্রধান একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল, দেশের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি। দেশের সংবিধানে সাংবিধানিক প্রধানদের ইতিকর্তব্য এমনভাবে নির্ধারিত রয়েছে, যাতে তাঁরা নির্বাচিত সংস্থাকে ছাপিয়ে না যেতে পারেন। কিন্তু দুঃখের হলেও সত্য যে আমাদের দেশের সংবিধান গৃহীত হবার পর থেকে একাধিকবার রাষ্ট্রপতি বা রাজ্যপালকে কেন্দ্রের শাসকদল তার রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করেছে। ২০১৪ সালে বিজেপি সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর থেকে এই প্রবণতা ভয়ঙ্করভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এনডিএ-র বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল দ্বারা পরিচালিত রাজ্য সরকারগুলিকে দুর্বল করতে বা বিপাকে ফেলতে রাজ্যপালকে ব্যবহার করার ঘটনা বেশি করে ঘটছে বর্তমানে। সম্প্রতি তামিলনাড়ুতে সে রাজ্যের রাজ্যপাল কৃত এই ধরনের ঘটনা ও তাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্টের রায় যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

তামিলনাড়ুর রাজ্যপালের কর্মকাণ্ড সংক্রান্ত ঃ

তামিলনাড়ুর ডি এম কে পরিচালিত রাজ্য সরকার বিধানসভায় পাশ হওয়া ১০টি বিল সেই রাজ্যের রাজ্যপাল আর এন রবির কাছে তাঁর সম্মতির জন্য পাঠালে, রাজ্যপাল দীর্ঘদিন ধরে সেই বিলগুলি নিয়ে কোনো পদক্ষেপ না করে তাঁর কাছে আটকে রাখেন। এমতাবস্থায় ঐ ১০টি বিল পুনরায় বিধানসভায় গ্রহণ করিয়ে রাজ্যপালের কাছে পাঠালেও রাজ্যপাল একই অবস্থানে অটল থাকেন এবং উক্ত ১০টি বিল তিনি রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। তামিলনাড়ু রাজ্য সরকার রাজ্যপালের এই কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি কে বি পার্দিওয়াল ও বিচারপতি আর মহাদেবনকে নিয়ে গঠিত দুই সদস্যের বেঞ্চ এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে ৪১৪ পাতার রায়ে রাজ্যপালের এই ভূমিকাকে সংবিধানগত ভাবে ত্রুটি হিসাবে ব্যাখ্যা করে। রায়ে উক্ত ১০টি বিল রাজ্যপালের সম্মতিপ্রাপ্ত ধরে নিয়ে রাজ্য সরকারকে অগ্রসর হতে বলা হয়েছে। এই ঐতিহাসিক রায়ের তাৎপর্য আরও বেশি এই কারণে যে এর মধ্য দিয়ে রাজ্যপাল এবং রাষ্ট্রপতি উভয় সাংবিধানিক প্রধানের নির্দিষ্ট দায়িত্ব পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা করে দেওয়া হয়েছে। এই রায়ে রাজ্যপালকে বিধানসভায় গৃহীত কোনো বিলে সম্মতিদান বা ফেরত পাঠানোর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ তিন মাস সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য বিধানসভা যদি সেই বিল পুনরায় গ্রহণ করে রাজ্যপালের কাছে পাঠায়, তাহলে তার এক মাসের মধ্যে সেই বিলে তাঁকে সম্মতি দিতে হবে। বিল আটকে রাখার সময়কাল নিয়ে যেটুকু ধোঁয়াশা ছিল এই রায়ে তা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালকে ব্যবহার করে বিধানসভায় গৃহীত বিল রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠিয়ে বিলম্ব দীর্ঘায়িত করার চেষ্টা করে। দুই বিচারপতির বেঞ্চ তাঁদের রায়ে এই ব্যাপারেও সুনির্দিস্ট সিদ্ধান্ত রেখেছেন। রায়ে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রেও এইরকম ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সময়কাল তিন মাস দেওয়া হয়েছে। সাধারণভাবে রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত বিলে যদি কোনো সাংবিধানিক বিষয়ে প্রশ্ন থাকে সে ক্ষেত্রে রাজ্যপাল সেই বিলগুলি রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠান। এই রায়ে রাষ্ট্রপতিকে সুপারিশ করা হয়েছে যে তাঁর উচিত এই ধরনের সাংবিধানিক প্রশ্নযুক্ত বিলগুলি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ নেওয়া। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতিকে তাঁর মতামত নির্দিষ্ট করতে বিচার বিভাগের পরামর্শ নিতে বলা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল এই পদগুলি থাকার কোনো বাস্তবতা আছে কিনা এই বিতর্ক দীর্ঘকালের। এই বিতর্কগুলি আরও বেশি করে মাথা চাড়া দেয় সাংবিধানিক প্রধানদের রাজনীতির বোঁড়ে হিসাবে শাসকদল কর্তৃক ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় এই ধরনের অপকৌশলকে আটকাতে অনেকটাই সহায়ক হবে।

ঐতিহাসিক এই রায়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে ১৯৯৪ সালে এস আর বোম্মাই মামলায় দেওয়া সুপ্রিম কোর্টের আরেকটি ঐতিহাসিক রায়ের। সেই রায় দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের নয় সদস্যের বেঞ্চ। রায়ের মধ্য দিয়ে সংবিধানের ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে রাজ্য সরকার ফেলে দেওয়া এবং রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো কেন্দ্রের স্বৈরাচারী প্রবণতার উপর প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছিল। সেই রায়েও রাজ্যপালের সুপারিশকেই এই ধরনের ভয়ঙ্কর ধারা প্রয়োগের ভিত্তি হিসাবে দায়ী করা হয়েছিল। তারপর থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করে একটি রাজ্য সরকার ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সাংবিধানিক প্রধানদের কাজের পরিসর সংক্রান্ত রায় দিতে গিয়ে রাজ্যপালের ভূমিকাকে সংবিধান সম্মত নয় বলেছে। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নম্বর ২০০-তে রাজ্য বিধানসভায় গৃহীত কোনো বিল বা আইন রাজ্যপালের সম্মতি গ্রহণের জন্য পাঠালে রাজ্যপালের করণীয় সম্পর্কে মূলত তিনটি উপায় বলা আছে। প্রথমত, বিধানসভায় গৃহীত বিলে সম্মতি প্রদান করা, দ্বিতীয়ত, ঐ বিলে তাঁর বিবেচনায় আসা কিছু প্রশ্ন ও মন্তব্য যোগ করে পুনরায় বিধানসভায় ফেরত পাঠানো। তৃতীয়ত, যদি রাজ্যপাল মনে করেন যে তাঁর কাছে পাঠানো বিলে সাংবিধানিক নীতি কোথাও লঙ্ঘিত হচ্ছে, তবে তিনি তা রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠাবেন। কিন্তু কোনোভাবেই রাজ্যপালকে অনন্তকাল ধরে অকারণে বিল আটকে রাখার অধিকার সংবিধান দেয়নি। তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল সেটাই করছিলেন। উপরন্তু তিনি আরেকটি কাজ করেছেন, যেটিও সংবিধান সম্মত নয়। সংবিধানে বলা আছে রাজ্যপাল তাঁর কাছে থাকা কোনো বিল যদি ফেরত পাঠান এবং সেই বিল যদি বিধানসভায় পুনরায় গৃহীত হয়ে তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে ঐ বিলে রাজ্যপালের সম্মতি প্রদান ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। এক্ষেত্রেও তামিলনাড়ুর রাজ্যপাল তাঁর সংবিধান বর্ণিত ভূমিকা পালন করেননি।

সুপ্রিম কোর্টের এই রায় দেশের গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষকে স্বস্তি দিয়েছে। বলা বাহুল্য দেশের সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপর আস্থাশীল সকল মানুষ এই রায়ে খুশি হয়েছে। কিন্তু এর বিপরীতমুখী স্রোতও আছে। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে যাদের কোনো যোগসূত্র নেই, যারা দেশের সংবিধানের মৌলিক ভিত্তিগুলির উপর আঘাত হানতে উদ্যত, তারা এই রায়ে ক্ষুব্ধ হয়েছে। এইরূপ ব্যক্তিবর্গের একদম প্রথম স্থানে রয়েছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল ও উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখর মশাই। উপরাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় তিনি সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়কে এই রায় প্রসঙ্গে আক্রমণ করে বলেন, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদকে (যেখানে বিচার ব্যবস্থার অধিকার, কর্তব্য বলা আছে) 'নিউক্লিয়ার মিসাইল'-এর মতো হাতিয়ার হিসাবে সুপ্রিম কোর্ট' ব্যবহার করছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। তিনি আরও বলেন যে, বিচার ব্যবস্থা 'সুপার পার্লামেন্ট'-এ পরিণত হয়ে সাংবিধানিক প্রধানদের নির্দেশিকা দিচ্ছে। ধনখরের মতে এটা নাকি ক্ষমতার বিভাজনের নীতিকে লঙ্ঘন করছে। ধনখরের এই মন্তব্যের সমালোচনা করেছেন প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবল। তিনি ধনখরের এই বক্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, এমন ঘটনা অতীতে কখনো ঘটেনি এবং এই মন্তব্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। সংবিধানের ৩৯ ধারায় উপরাষ্ট্রপতির দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে বলা আছে যে, উপরাষ্ট্রপতি সংবিধান ও আইনকে সংরক্ষণ করতে, রক্ষা করতে এবং এর উপর যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ। উপরাষ্ট্রপতি থাকাকালীন জগদীপ ধনখর এর উল্টো পথে হেঁটেছেন। আসলে তিনি সুপ্রিম কোর্টকে আক্রমণ করার জন্য একটি আইনি রক্ষাকবচকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করেছেন। কোড অব সিভিল প্রসিডিওর, ১৯০৮-এর ১৩৩ ধারা অনুযায়ী উপরাষ্ট্রপতিকে বিচারালয়ে তলব করতে কিছু পদ্ধতিগত বাধা আছে।

কেরালার নবনিযুক্ত রাজ্যপাল এই রায়কে বিচার বিভাগের সীমালঙ্ঘন আখ্যা দিয়েছেন। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে এই রায়কে আক্রমণ করে বলেছেন যে সুপ্রিম কোর্টই যদি আইন তৈরী করে, তবে পার্লামেন্ট বন্ধ করে দেওয়া হোক। আরেক বিজেপি এম পি দীনেশ শর্মা বলেছেন, বিচার ব্যবস্থা তো নয়ই, কেউ রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলতে অথবা সংসদকে নির্দেশ দিতে পারে না। এইসব আক্রমণাত্মক বক্তব্য কার্যত সংবিধানকে অস্বীকার করে।

প্রতিটি সাংসদকে শপথ নিতে হয়, সংবিধানের উপর বিশ্বাস ও আনুগত্য বজায় রাখার, দেশের সার্বভৌমত্ব ও সংহতিকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার। সংবিধানের ৯৯ অনুচ্ছেদের ১১১ নম্বর ধারাতে তা বলা আছে। অথচ বিজেপি নেতা-সাংসদরা সংবিধানের তোয়াক্কা করছেন না। বিজেপিও দলগতভাবে এদের সতর্ক করছে না। এটা স্মরণে রাখা প্রয়োজন সংবিধানের ১৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের বাক্ স্বাধীনতা অবশ্যই আছে। আবার ১৯-এর ১(ক) ধারা অনুযায়ী বাক্‌স্বাধীনতার উপরও কিছু নিয়ন্ত্রণবিধি রয়েছে, যার মধ্যে আদালত অবমাননার বিষয়টি আছে। কোনো বক্তব্য যদি বিচারালয়ের কর্তৃত্বকে খাটো করে অথবা খাটো করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয় সেই বক্তব্য আদালত অবমাননার দায়ে পড়ে। কনটেম্পট অব কোর্ট অ্যাক্ট, ১৯৭৯-এর ২(গ) ধারায় তা বিবৃত আছে। তাই বলে বিচারালয়ের কোনো রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা করা আর আদালত অবমাননা এক বিষয় নয়। সর্বোচ্চ আদালত একাধিক ক্ষেত্রে এই ধরনের বক্তব্য বলেছে। উদাহরণ হিসাবে ২০০১ সালে অরুন্ধতী রায়-এর একটি মন্তব্য নিয়ে আদালত অবমাননার মামলায় সর্বোচ্চ আদালত বলে যে সৎ উদ্দেশ্যে সমালোচনা বা বিচারালয়ের কাজকর্ম নিয়ে মন্তব্য আদালত অবমাননা নয়। ২০১০ সালে হরি সিং নাগরা বনাম কপিল সিবল মামলায় সর্বোচ্চ আদালত ইতিবাচক সমালোচনা স্বাগত জানালেও বিচার ব্যবস্থার কর্তৃত্বের অবমূল্যায়ন সম্পর্কে সাবধান করে।

বিজেপি সাংসদরা সুপ্রিম কোর্ট কর্তৃক রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপালদের ক্ষমতার অপব্যবহারে রাশ টানার ঐতিহাসিক রায়কে সমালোচনা করতে গিয়ে সংবিধান, বিচার ব্যবস্থা উভয়ের অবমাননা করেছে। সর্বোচ্চ আদালত ইতিমধ্যে সাংসদ নিশিকান্ত দুবের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা করতে অ্যাটর্নি জেনারেলের সম্মতি চেয়েছে। বিজেপি-আর এস এস চায় বিচার ব্যবস্থাকে সংসদের অধীনস্থ করতে। আইনসভায় পাস হওয়া যে কোনো আইন, সেটি সংবিধানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তা পর্যালোচনা করার অধিকার সর্বোচ্চ আদালতের আছে। সম্প্রতি ওয়াকফ্ আইন সংশোধনীর তিনটি ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। বিজেপি-আর এস এস আদালতের এই ক্ষমতাকে খর্ব করতে চায়। কারণ সর্বোচ্চ আদালতের সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা তাদের স্বৈরাচারকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে বাধা দেয়। মাননীয় রাষ্ট্রপতি ইতিমধ্যে এই রায় প্রসঙ্গে কিছু প্রশ্নাবলী সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছেন।

ভারতীয় বিচার ব্যবস্থার ইতিহাসে সর্বোচ্চ আদালতের এই রায় নিঃসন্দেহে একটি মাইল ফলক হয়ে থাকবে। কেন্দ্রের শাসকদল কর্তৃক সাংবিধানিক প্রধানদের নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বড় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে এই রায়। ঠিক তেমনি এই রায় দেশের বিচার ব্যবস্থার উপর জনসাধারণের আস্থা আরও বৃদ্ধি করবে। সাম্প্রতিক সময়ে কিছু বিচারপতির বক্তব্য জনমাধ্যমে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রামমন্দির সংক্রান্ত রায় প্রসঙ্গে বলেছেন যে সেই রায় নাকি 'ঐশ্বরিক হস্তক্ষেপের' ভিত্তিতে হয়েছে। সেই ব্যক্তিই গুজরাটের দ্বারকা মন্দির পরিদর্শনের পর আইনজীবীদের একটি সমাবেশে বলেন যে সেই মন্দিরের মাথায় অবস্থিত গেরুয়া ঝান্ডা ন্যায়ের পতাকা হিসেবে স্থাপিত হয়েছে। এই বক্তব্যগুলি সাধারণ মানুষের মনে সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা সম্বন্ধে প্রশ্ন এনে দেয়। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের দুই সদস্যের বেঞ্চ সম্প্রতি একটি রায় প্রসঙ্গে বলেছে যে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের জন্য আর এস এস-র মতো বিখ্যাত সংগঠনকে নিষিদ্ধ করা ভুল সিদ্ধান্ত ছিল। তখন খুব স্বাভাবিকভাবেই জনমানসে এই প্রশ্ন ওঠে যে বিচারালয় আর এস এস-এর হিন্দুত্ব রাজনীতির পক্ষে ওকালতি করছে কি? আবার সাম্প্রতিককালে শ্রমিক-কর্মচারী-সাধারণ মানুষের স্বার্থে একাধিক উল্লেখযোগ্য রায় সুপ্রিম কোর্ট ও বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টগুলি প্রদান করেছে। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের এই রাজ্যের কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ প্রদান সংক্রান্ত রায় উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যের হাইকোর্টের রাজ্য সরকারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলায় ইতিবাচক রায়, কর্মচারীদের ষষ্ঠ বেতন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ সংক্রান্ত রায় ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে গণআন্দোলন ও ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকে আটকানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে রায় অবশ্যই এই ক্ষেত্রে উল্লেখ্য। একইসাথে রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালকে কেন্দ্রের শাসকদলের দাবার বোঁড়ে হিসাবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে রায় একটি মাইলস্টোন হয়ে থাকবে।

উর্দু ভাষা সংক্রান্ত ঃ

সুপ্রিম কোর্টের সাম্প্রতিক অপর একটি রায়ও অত্যন্ত গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতে ১৬০০টিরও বেশি ভাষা আছে। কিন্তু একটি ভাষাকে সাম্প্রদায়িক শক্তি ধর্মীয় মেরুকরণের কাজে ব্যবহার করতে চায়। সেটি হল উর্দু ভাষা। ভাষার যে কোনও ধর্ম হয় না বা ধর্মেরও কোনও ভাষা হয় না সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের সাম্প্রতিক একটি রায়।

মহারাষ্ট্রের আকোলা জেলার পাকুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিল ভবনের একটি উর্দু সাইন বোর্ড ছিল ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু। উর্দু সাইন বোর্ডের বদলে মারাঠী সাইন বোর্ড লাগাতে হবে এই বক্তব্যকে সারমর্ম করে সুপ্রিম কোর্টে একটি পিটিশন দাখিল হয়। সুপ্রিম কোর্ট এপ্রসঙ্গে তার রায়ে চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা দেয়, "উর্দু একটি ভারতীয় ভাষা। যে কোনো ভাষা একটি সম্প্রদায়, এলাকা এবং জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে, কিন্তু কোনো ধর্মকে প্রতিনিধিত্ব করে না। উর্দু ভাষার সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। ভারতে জন্ম নেওয়া ও বিকশিত হওয়া এই ভাষা গঙ্গা-যমুনি তেহজীব (সংস্কৃতি) বা হিন্দুস্তানী তেহজীব-এর একটি চমৎকার উদাহরণ।"

গোটা দেশের প্রগতিশীল মানুষ সুপ্রিম কোর্টের এই অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছে। এর কারণ এই রায় এমন সময় ঘোষিত হয়েছে যখন প্রতিক্রিয়ার শক্তি দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধ্বংস করে বিভাজনের ঝড় সৃষ্টি করছে। জীবনের সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয়কে যখন ধর্মীয় প্রেক্ষিতে বিচার করা হচ্ছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই উর্দুকে একটি ধর্মীয় ভাষা বা ইসলাম ধর্মের ভাষা হিসাবে দেগে দিতে চাইছে। কিন্তু এভাবে বলা যায় না। তাহলে ভারতের প্রচুর ধর্মীয় গ্রন্থ আছে যা আদপে সংস্কৃত ভাষায় লেখা। তাই বলে সংস্কৃত কোনো নির্দিষ্ট ধর্মের ভাষা তো নয়। এমনকি এটা বর্তমানকার প্রতিক্রিয়ার শক্তিও মনে করে না। যদি তাই করতো তাহলে হিন্দুত্ববাদীরা দেশের সব নাগরিকের জন্য সংস্কৃত ভাষায় কথা বলা, লেখা ও পাঠ করা বাধ্যতামূলক করত। সেটা তো তারা করছে না। আসলে এটাই প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিভাজনের রাজনীতির বৈশিষ্ট্য।

সাম্প্রদায়িক মৌলবাদী শক্তির অন্যতম হাতিয়ার হল ইতিহাসের বিকৃতি। ওরা মানুষের কাছে প্রকৃত ইতিহাসের বদলে মিথ্যা বা অর্ধ সত্য তুলে

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমে

যুদ্ধোন্মাদনার সেকাল-একাল এবং রবীন্দ্রনাথ

শাশ্বতী মজুমদার

“হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব/ ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ”— রবীন্দ্রনাথ গানটি লিখেছিলেন ১৯২৭ সালে ৫ মার্চ। ঐ বছরই প্রবাসী পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত হয় গানটি বুদ্ধের জন্মোৎসব উপলক্ষে। প্রায় একশ’ বছর পরে আজকের পৃথিবীর যুদ্ধোন্মাদনার পরিস্থিতিতেও এই গানের কথাগুলি চাবুকের মতো আঘাত করে। রবীন্দ্রনাথ রাষ্ট্রনায়ক বা রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না, তিনি সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর কবিমনের সংবেদনশীলতা নিয়ে, ইতিহাস সচেতন সমাজমনস্ক চিন্তাশীলতা নিয়ে তিনি সমকালীন নিজের দেশ এবং পৃথিবীর প্রায় সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ে যেভাবে উদ্বেলিত হয়েছেন এবং নিরন্তর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, এমন উদাহরণ সম্ভবত আর দ্বিতীয় কাউকে পাওয়া যাবে না। হিংসার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যলোভী বর্বরতার বিরুদ্ধে তরুণ বয়স থেকে শুরু করে আমৃত্যু রবীন্দ্রনাথের কলমে ধিক্কার উচ্চারিত হয়েছে। ১৯০১ সালে প্রকাশিত ‘নৈবেদ্য’ কাব্যগ্রন্থের ৬৪ নম্বর কবিতা লেখা হয়েছিল বুয়র যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে। দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল অঞ্চলে বুয়র যুদ্ধ (১৯৮৯-১৯০২) শুরু হয় হীরে ও সোনার খনির লোভে যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ওলন্দাজ বংশোদ্ভূত কৃষিজীবি সম্প্রদায় বুয়রদের স্বাধীন রাজ্য অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট এবং সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক অন্যায়ভাবে আক্রমণ করে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ‘‘শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ-মাঝে/অস্ত গেল, হিংসার উৎসবে আজি বাজে/অস্ত্রে অস্ত্রে মরণের উন্মাদ রাগিনী/ভয়ংকরী।...”

ব্রিটিশরা ঐ যুদ্ধে কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে প্রায় দেড় লক্ষ মানুষকে বন্দী করে, ৪৭ হাজারেরও বেশি বুয়র, কৃষ্ণ আফ্রিকান এবং বান্টু উপজাতির মানুষকে হত্যা করে। রুডিয়ার্ড কিপলিং, হেনরী নিউবোল্ট, এ.সি. সুইনবার্নের মতো কবি সাহিত্যিকদের সাম্রাজ্যবাদী নীতির পক্ষে পোঁ ধরতে দেখে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—‘‘জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায়/ ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়।/কবিদল চিৎকারিছে জাগাইয়া ভীতি/ শ্মশানকুক্কুরদের কাড়াকাড়ি-গীতি।” সে যুগেও ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান বা ডেলি ক্রনিকল বাদ দিলে দ্য টাইম সহ গোটা ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দাঁড়িয়েছিল ইংরেজদের পক্ষে।

ঐ ‘নৈবেদ্য’ তেই ৬৫ নম্বর কবিতায় লিখছেন—

‘‘ছুটিয়াছে জাতিপ্রেম মৃত্যুর সন্ধানে/বাহি স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্বতের পানে।”

নৈবেদ্যরও অনেক আগে ভারতীতে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধের সংকলন ‘বিবিধ প্রবন্ধ’ (১৮৮৩ সাল) প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের তখন বাইশ বছর বয়স। সেখানেই তিনি ‘দয়ালু মাংসাশী’ নামে রচনায় তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অসার যুক্তিকে। রক্ষণশীল দলের প্রধানমন্ত্রী ডিজরেইলীর সম্প্রসারণবাদী নীতির সমালোচনায় এই লেখায় দক্ষিণ আফ্রিকার ইঙ্গ-জুলু যুদ্ধ, ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কথা এসেছে একই সঙ্গে। জীবনের প্রথম ইউরোপ যাত্রায় (১৮৭৮-১৮৮০ সাল) রবীন্দ্রনাথ ১৮৭৯ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে হাউস অফ কমন্সে সাংসদ জন ব্রাইট, উইলিয়াম গ্ল্যাডস্টোন প্রমুখের বক্তৃতা শুনেছিলেন। সেই আঠারো বছরের সদ্য তরুণের মনে তিক্ততা তৈরী হয়েছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইরিশ সহ-সাংসদের প্রতি ইংরেজ সাংসদদের অসৌজন্যমূলক আচরণ দেখে। এরপর তিনি আবার ইউরোপে যান ১৮৯০ সালে। এই দুই পর্বের ভ্রমণ বৃত্তান্তে—য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র এবং য়ুরোপ যাত্রীর ডায়েরি-তে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, কর্মোদ্যমের যেমন প্রশংসা আছে তেমনি গণতন্ত্রের পীঠস্থান ইংল্যান্ডে ইংরেজরা নিজেদের ক্ষেত্রে উদার গণতন্ত্রের যে মাপকাঠি ঠিক করে উপনিবেশগুলিতে পদে পদে তাকে লঙ্ঘন করে, পরাধীন দেশের তরুণ কবির লেখায় সেটা গোপন থাকেনি। তবু বারবার তিনি ইউরোপে গেছেন ‘‘ইউরোপের মানুষকে জানবার জন্য”, মনের জানলা খোলা রেখে ইউরোপের সভ্যতা, শিল্প-সাহিত্যকে জানবার জন্য। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দুটি বিশ্বযুদ্ধের বীভৎসতা দেখলেন কবি। এর ঠিক আগে ১৯১২-১৩ সালে ইউরোপ বাসের সময় কবি ধনমদমত্ত ইউরোপের অর্থনৈতিক ভাঙন, দেশে দেশে উগ্র জাতীয়তার আগ্রাসী রূপ দেখলেন। সেই বেদনা নিয়ে যখন তিনি লিখলেন—‘‘এবার যে ওই এল সর্বনেশে গো/ বেদনায় যে বান ডেকেছে/ রোদনে যায় ভেসে গো”—‘সর্বনেশে’, ‘বলাকা’ (১৯১৬ সালে প্রকাশিত)। তার অল্প কিছুদিন পরে শুরু হলো প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ১৯১৪ সালে আগস্টে হিটলার বেলজিয়াম আক্রমণ করলে লিখলেন গান—বাধা দিলে বাঁধবে লড়াই। ‘পাড়ি’ কবিতায় লিখলেন (বলাকা কাব্য গ্রন্থ)—‘‘মত্ত সাগর দিল পাড়ি গহন রাত্রিকালে ওই যে আমার নেয়ে”। এন্ড্রুজকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘‘রুক্ষ অলক উড়ে পড়ে, সিক্ত-পলক আঁখি / ভাঙা ভিতের ফাঁক দিয়ে তার বাতাস চলে হাঁকি/দীপের আলো বাদল-বায়ে কাঁপছে থাকি থাকি/ছায়াতে ঘর ছেয়ে।”—অপেক্ষারত সেই মেয়েটি বেলজিয়ামের প্রতীক। ঐ বছর খ্রিস্টের জন্মদিন উপলক্ষে লিখেছিলেন ‘হে মোর সুন্দর’ [বিচার] (বলাকা)-‘‘হে রুদ্র আমার/মার্জনা তোমার/গর্জমান বজ্রাগ্নিশিখায়,/ রক্তের বর্ষণে,/অকস্মাৎ সংঘাতের ঘর্ষণে ঘর্ষণে।” শান্তিনিকেতনে প্রার্থনা সভায় তাঁর ভাষণ—‘মা মা হিংষী’, ‘পাপের মার্জনা’। ১৯১৮ সালে লিখলেন ‘কালান্তর’ প্রবন্ধ। জীবনের শেষ প্রান্তে ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসে তাঁর অভিভাষণ—‘সভ্যতার সংকট’। সে সংকট থেকে পৃথিবী আজও মুক্ত হতে পারলো কই!

* * *

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেই ১৯১৬ সালের মে মাসে রবীন্দ্রনাথ প্রথম জাপানে গিয়েছিলেন। এর পরও তিনি ১৯২৪ এবং ১৯২৯ সালে জাপানে গেছেন। ১৯০৫ সালে রাশিয়া-জাপ যুদ্ধে প্রাচ্যের দেশ জাপানের জয়ে রবীন্দ্রনাথ খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু ১৯১৬ সালে সাড়ে তিন মাসের জাপানবাসের সময়ে তিনি সেই দেশকে যেভাবে দেখলেন এবং বুঝলেন তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। একদিকে জাপানের শিল্প, সাহিত্য, নৃত্যকলা, চারুকলা, ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যে গভীর সৌন্দর্যবোধ ও রসবোধের প্রকাশ এবং অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের অনুকরণে আধুনিক জাপানের সাম্রাজ্যলালসা, উগ্র জাতীয়তা, যুদ্ধোন্মাদনা—এই বৈপরীত্য তাঁকে বিস্মিত ও পীড়িত করেছিল। ‘জাপান যাত্রী’ বইতে লিখছেন—‘‘জাপান ঘুরোপের কাছ থেকে কর্মের দীক্ষা আর অস্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। তার কাছ থেকে বিজ্ঞানের শিক্ষাও সে লাভ করতে বসেছে। জাপানি সভ্যতার সৌধ এক মহলা- সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি এবং দক্ষতার নিকেতন। সেখানকার ভান্ডারের সবচেয়ে বড়ো জিনিস যা সঞ্চিত হয়, সে হচ্ছে কৃতকর্মতা। সেখানকার মন্দিরে সবচেয়ে বড়ো দেবতা স্বাদেশিক স্বার্থ। জাপান তাই সমস্ত য়ুরোপের মধ্যে সহজেই আধুনিক জর্মনির শক্তি-উপাসক নবীন দার্শনিকদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে পেরেছে; নীটসের গ্রন্থ তাদের কাছে সবচেয়ে সমাদৃত।”

জাপান প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ১৯১৪ সালে মিত্র শক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছিল চীন সহ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে জার্মানিকে নিজের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে। চীনও ঐ বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তিতে ছিল নিজের এলাকা জার্মানির কাছ থেকে উদ্ধারের আশায়। জার্মানি ইউরোপের যুদ্ধে ব্যস্ত থাকার সুযোগে তারা জার্মানির কাছ থেকে শানটুং প্রদেশের কিংডাও বন্দর দখল করে

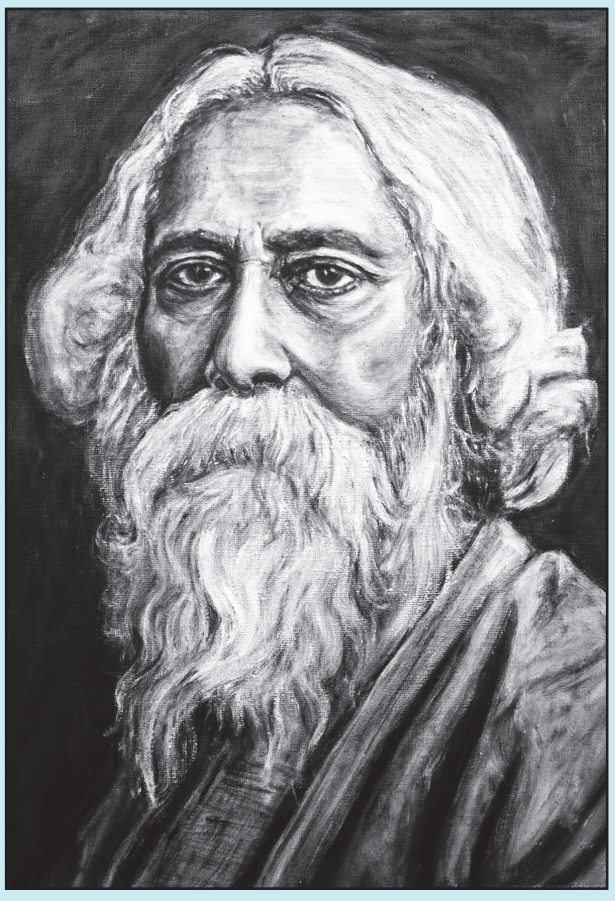

নেয়। এরপর চীন নিজ এলাকার অধিকার চাইলে জাপান টালবাহানা করে অবশেষে ১৯১৫ সালে চীনের পক্ষে অমর্যাদাকর ২১ দফা দাবি প্রস্তাব করে।

জাপান সরকারের সাম্রাজ্যলোভী ভূমিকায় আশাহত হলেও রবীন্দ্রনাথ স্থির করলেন তিনি জাপানীদের কাছে নিজের ভাবনা ব্যক্ত করবেন। পরবর্তী গন্তব্য আমেরিকায় ভাষণের জন্য ‘ন্যাশনালিজম’ বক্তৃতামালার প্রস্তুত করছিলেন। তারই অংশ নিয়ে টোকিও ইম্পেরিয়াল ও কেইয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি বক্তৃতা দিলেন—‘The message of India to Japan’ এবং ‘The spirit of Japan’। জাপানে বসে জাপান সরকারের সমালোচনার ফল ভালো হলো না। বক্তৃতার আগে রবীন্দ্রনাথ বিপুল সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। কিন্তু বক্তৃতার পরে ‘‘কোন অদৃশ্য শক্তির গোপন চোখ রাঙানীতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি লোকের প্রীতি ভালবাসা ম্লান নিষ্প্রভ হইয়া গেল।” [রবীন্দ্র জীবনী] রবীন্দ্রনাথ এতে ভয় পেলেন না। তিনি বুঝতে পারলেন সামনের আমেরিকা সফরে কী হতে চলেছে।

১৯৩১ সালে জাপান চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। আয়রনি হলো, দুটি দেশেরই রয়েছে অহিংস বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস। ঐবছর খ্রিস্টোৎসবে জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রনাথ ‘নটির পূজা’র মঞ্চায়ন করেন এবং বই আকারে প্রকাশও করেন, যে নাটকে নটি শ্রীমতি রাজ আদেশ অমান্য করে বুদ্ধের পূজা দিতে যায় এবং রাজসৈন্যদের হাতে প্রাণ দেয়। ‘হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী’ গানটি ঐ নাটকে যুক্ত করা হয়। ১৯৩৬ সালে জাপান আবার চীন আক্রমণ করে নানকিং দখল করে ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত গণহত্যা, ধর্ষণ, লুঠ, অগ্নিসংযোগ চালিয়ে ইতিহাসে অন্যতম বর্বর যুদ্ধাপরাধ সংগঠিত করে। প্রায় ৩ লক্ষাধিক মানুষ নিহত হয়, ২০০০০ নারী ও শিশু ধর্ষিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ‘প্রান্তিক’-এর ৩৭ নম্বর কবিতায় লেখেন—‘‘.... মহাকালসিংহাসনে/

সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,/ কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী/

কুৎসিত বীভৎসা-’পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন/

নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের/

হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে/

নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।”

পৃথিবী জানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তিতে যোগ দিয়ে যুদ্ধে অংশ নেওয়া জাপানের শেষ পরিণতি হয়েছিল হিরোশিমা নাগাসাকিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পারমাণবিক বোমায়—‘আপন চিতার ভস্মতলে’। রবীন্দ্রনাথ তখন আর পৃথিবীতে নেই।

* * *

গত শতকের তিন দশক জুড়ে এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে হিংসার কুৎসিত চেহারা জেগে উঠতে দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, আশ্চর্যজনক ভাবে একশ’ বছর পার করে পশ্চিম এশিয়া জুড়ে আজ তেমনি হিংসার হলাহল। দুই সময়ের পৃথিবীর দুটি পৃথক অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে পার্থক্য অনেক, কিন্তু মিলও প্রচুর।

গত শতকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত পূর্ব এশিয়ার আগ্রাসী শক্তি ছিল জাপান, এই শতকে মধ্য প্রাচ্যে সম্প্রসারণবাদী শক্তির নাম ইজরায়েল, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার। ইহুদি ধর্মতত্ত্ব অনুযায়ী কাল্পনিক মানচিত্রের ভিত্তিতে ‘বৃহত্তর ইজরায়েল’ তার লক্ষ্য। অবরুদ্ধ গাজা স্ট্রিপ সহ ছ’টা দেশ ইজরায়েলের ধারাবাহিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু। ৭ অক্টোবর ২০২৩ থেকে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে ১৮,২৩৫টি, লেবাননে ১৫,৫২০টি, সিরিয়ায় ৬১৬টি, ইরানে ৫৮টি, ইয়েমেনে ৩৯টি নথিভুক্ত হামলা করেছে ইজরায়েল। ১৯৩৬ সালে রবীন্দ্রনাথ নানকিং আক্রমণের সময়ে লিখেছিলেন—

‘‘এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে

উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে

যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,

আকাশেরে করিল অশুচি।” [প্রান্তিক] এই ভয়াবহতার স্মৃতি যেন আজ অবরুদ্ধ গাজার বুকে এয়ারস্ট্রাইক, ড্রোন হামলা, হাসপাতাল, স্কুল, শিশুদের ওপর টার্গেটেড বম্বিং হয়ে নেমে এসেছে, যেখানে ৫০০০০-এর ওপর শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। প্রতি ৪৫ মিনিটে একটি শিশু খুন হচ্ছে। আর এই পরিস্থিতিতে ইজরায়েলকে নিয়ন্ত্রণ করতে রাষ্ট্রসংঘ ব্যর্থ; সেদিনও যেমন জাপানকে বাধা দিতে ব্যর্থ হয়েছিল লীগ অফ নেশনস—

‘‘রাষ্ট্রপতি যত আছে/

প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ/

রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে।

সংশয়ে সংকোচে।” কারণ ১৯৪৮ সালে ইজরায়েলের জন্মের সময় থেকে সোভিয়েত অবলুপ্তির আগে পর্যন্ত আরব দেশগুলির মধ্যে ব্রিটিশ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইজরায়েল নীতির প্রশ্নে যে ঐক্য ছিল ১৯৯১ সালের পর থেকে ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যবাদের কলাকৌশলে সেই ঐক্য চূর্ণ হয়ে গেছে। ১৯৯৪ সাল থেকে ন্যাটোর ‘মেডিটেরেনিয়ান ডায়লগ’ কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আরও ছ’টি অ-ন্যাটো দেশ—আলজেরিয়া, মিশর, টিউনিশিয়া, জর্ডন, মরোক্কো, মাউরিটানিয়া—ইজরায়েলেরই সঙ্গে ন্যাটোর সহযোগী। ইরাক, লিবিয়াতে আগেই ঘটেছে সাম্রাজ্যবাদীদের কাঙ্ক্ষিত পালাবদল।

প্যালেস্তাইন সমস্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালেই আমেরিকা ভ্রমণকালে ‘Jewish Standard’ পত্রিকাকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। ইজরায়েল নামে রাষ্ট্রটি তৈরি হওয়ার ১৮ বছর আগে। জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন বিশ্ব নাগরিকতার ভাবনায় ভাবিত আইনস্টাইন, যিনি নিজে ইহুদি ছিলেন, তিনি যে অর্থে জায়নবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করতেন। ইহুদিদের ওপর যে নির্যাতন হয়েছে সেবিষয়ে তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ইহুদি জাতির সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে তিনি যেমন সম্মানের চোখে দেখতেন, আরবদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকেও শ্রদ্ধা করতেন। ইহুদিদের পুনর্বাসন তিনি চেয়েছিলেন। কিন্তু পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ইহুদিদের কোনো পৃথক জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ফল ভালো হবে না, এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন কমনওয়েলথ অফ প্যালেস্টাইনের, যেখানে ইহুদি এবং আরবরা স্ব স্ব ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নিয়ে সহ নাগরিক হিসাবে শান্তিতে বসবাস করবে। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইহুদি এবং আরবদের বিভাজিত করতে চায় এটা তিনি জানতেন। তাই সতর্ক করেছিলেন—“The Palestine problem cannot be solved in London by any negotiations between the British Government and the Zionist leaders. The success of Zionism depends entirely on Arab-Jewish cooperation. This can be obtained in Palestine only by means of direct understanding between the Arabs and Jews. If the Zionist leadership will insist on separating Jewish political and economic interests in Palestine from those of Arabs ugly eruptions will occur in the Holy Land.” ঘৃণার ‘কুৎসিত বিস্ফোরণ’-এ আজ গাজার ক্ষুধিত মানুষ পেটে বুলেট নিয়ে প্রতিদিন মারা যাচ্ছে শ’য়ে শ’য়ে।

মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিকতম সঙ্কট তৈরী হয়েছে ইজরায়েল-ইরান যুদ্ধকে ঘিরে। গত ১২ জুন সম্পূর্ণ অপ্ররোচিতভাবে ইজরায়েল ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে বোমা বর্ষণ করে ইরানের পারমাণবিক বোমা তৈরী করার কোনো প্রমাণ ছাড়াই। ইরান তৎক্ষণাৎ বোমারু বিমানের বদলে মিসাইলে প্রত্যুত্তর দেওয়ায় দীর্ঘদিন বাদে ইজরায়েলের প্রমত্ত আক্রমণ বাধার মুখে পড়ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে পড়ায় পরিস্থিতি সবদিক দিয়েই জটিল হয়েছে। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি সম্পূর্ণভাবে ইজরায়েলের পক্ষে। জার্মান চ্যান্সেলরের বক্তব্য, ‘‘ইজরায়েল আমাদের সবার হয়েই নোংরা কাজটা করছে।” অর্থাৎ, তাদের লক্ষ্য ইজরায়েলের রাজনৈতিক

● ষষ্ঠ পৃষ্ঠার প্রথম কলমে

পঞ্চম পৃষ্ঠার পরে

যুদ্ধোন্মাদনার সেকাল-একাল এবং রবীন্দ্রনাথ

পালাবদল। এতে স্পষ্টতই তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক স্বার্থ জড়িত। ১৯৭৯ সাল থেকে ইরানে ইসলামী মৌলবাদীদের যে অন্যায়, জবরদস্তিমূলক শাসন চলছে তাতে সে দেশের মানুষের ক্ষুব্ধতা বারেবারেই বিস্ফোরিত হয়েছে এবং হচ্ছে। কিন্তু বিদেশীদের হাতে হাতে 'পালাবদল' যে আত্মহত্যার শামিল তা ইরানীরা বুঝেছে এবং ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ করছে। ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণের সময়ে সেখানকার কমিউনিস্ট পার্টি যে ভুল করেছিলো ২০২৫ সালে ইরানের তুদের পার্টি সে ভুল করেনি। রবীন্দ্রনাথ ইরানের অতীত ও তাঁর সমকালীন ইতিহাস সম্পর্কে লিখেছিলেন, ''পারস্য বারবার পরজাতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আপন পারসিক ঐক্যকে দৃঢ় করবার ও জয়ী করবার চেষ্টা করেছে।'' (পারস্য যাত্রী)

১৯৩২ ও ১৯৩৪ সালে সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথ দু'বার দুর্বল শরীর নিয়েও ইরানে গেছিলেন—প্রথমবার সম্রাট রেজা শাহ পহলভীর নিমন্ত্রণে, দ্বিতীয়বার কবি ফেরদৌসীর জন্মসহস্রাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষে। রবীন্দ্রনাথের 'পারস্য যাত্রী' পড়লে বোঝা যায় কবি হাফিজ বা সাদির দেশ পারস্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ তো ছিলই, পারস্যের সঙ্গে সুদূর অতীত থেকে ভারতবর্ষের আত্মিক যোগসূত্রের জন্যও পারস্যকে ইউরোপ আমেরিকার তুলনায় তাঁর আপন মনে হয়েছিল। কিন্তু তাঁর আকর্ষণের কেন্দ্রে ছিল সেদিনের পারস্যে রেজা শাহ পহলভীর নেতৃত্বে ইরানে যে আধুনিকতার উন্মেষ হয়েছিল তার কর্মকাণ্ড, শিক্ষা, নারীদের স্বাধীনতা। 'পারস্য যাত্রী'তে শুধু পারস্যের আধুনিকীকরণের কথা নয়, তুরস্কের কামাল পাশার কথা বলছেন রবীন্দ্রনাথ। ইরানের পুতুল সরকারের মাধ্যমে দেশের উত্তরাংশে সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়া এবং দক্ষিণাংশে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শোষণ চালাতো; রেজা শাহ তাদের সরিয়ে দেশকে স্বাধীন ও স্বাবলম্বী করেছেন একথা বলার সময়ে তিনি বলতে ভোলেন না রাশিয়ায় বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকারের ইরানের ওপর দখলদারিত্ব স্বেচ্ছায় ছেড়ে দেবার এবং সোভিয়েতের দক্ষিণদিকের মুসলিম অধ্যুষিত ছোট প্রদেশগুলির উন্নতি এবং অধিকারের কথা। বোঝা যায় একদিকে পাশ্চাত্যের ধনতন্ত্র ও যন্ত্র সভ্যতার নিষ্ঠুরতা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। অন্যদিকে নিজের দেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবৃক্ষ উত্তরোত্তর বেড়ে উঠতে দেখে উদ্বিগ্ন রবীন্দ্রনাথ প্রাচ্যের এই দেশগুলির নতুন কর্মপ্রেরণার মধ্যে বিকল্পের খোঁজ করছিলেন। তাই পারস্য যাত্রীতে লিখছেন, ''সাম্প্রদায়িক ধর্ম জিনিসটাই সাবেক কালের জিনিস। পুরাকালের কোনো-একটা বাঁধা মত ও অনুষ্ঠানকে সকল কালেই সকলে মিলে মানতে হবে, এই হচ্ছে সম্প্রদায়ের শাসন। বস্তুত এতকাল রাজশক্তি ও পুরোহিতশক্তি জুড়ি মিলিয়ে চলেছে। উভয়েই জনসাধারণের আত্মশাসনভার, চিন্তার ভার, পূজার ভার, তাদের স্বাধীন শক্তি থেকে হরণ করে অন্যত্র এক জায়গায় সংহত করে রেখেছে। ব্যক্তিবিশেষ যদি নিজের চিন্তাশক্তির প্রবর্তনায় স্বাতন্ত্র্যের চেষ্টা করে তবে সেটাকে বিদ্রোহের কোঠায় ফেলে তাকে প্রাণান্তকর কঠোরতার সঙ্গে শাসন করে এসেছে।... বিষয়াসক্তির মোহে মানুষ যত অন্যায়ী যত নিষ্ঠুর হয়, ধর্মমতের আসক্তি থেকে মানুষ তার চেয়ে অনেক বেশি ন্যায়ভ্রষ্ট অন্ধ ও হিংস্র হয়ে ওঠে, ইতিহাসে তার ধারাবাহিক প্রমাণ আছে; আর তার সর্বনেশে প্রমাণ ভারতবর্ষে আমাদের ঘরের কাছে প্রতিদিন যত পেয়ে থাকি এমন আর কোথাও নয়।'' 'মানুষের ধর্ম' এবং 'রিলিজিয়ন অফ ম্যান'-এর লেখক তেহরানে এক জনসভায় বলেছিলেন, ''এশিয়ার প্রত্যেক দেশ আপন শক্তি প্রকৃতি ও প্রয়োজন অনুসারে আপন ঐতিহাসিক সমস্যা স্বয়ং সমাধান করবে, কিন্তু আপন উন্নতির পথে তারা প্রত্যেকে যে প্রদীপ তার আলোক পরস্পর সম্মিলিত হয়ে জ্ঞানজ্যোতির সমবায় সাধন করবে। চিত্তের প্রকাশ যখন আমাদের থাকে না তখন আমরা আলোকহীন তারার মতো, অন্য জ্যোতিষ্কের সঙ্গে আমাদের জাতি সম্বন্ধ অবরুদ্ধ। চিত্তের আলো যখন জ্বলে তখনই মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সত্য হয়ে ওঠে।''

* * *

১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার আগে গিয়েছিলেন ইউরোপে তিনবার এবং আমেরিকায় একবার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আমরা দেখি রবীন্দ্রনাথ ক্লান্তিহীন বিশ্ব-পরিক্রমায় রত। পাঁচ মহাদেশের ৩২টি দেশে তিনি গেছেন। তীব্র হিংসার পরিবেশে দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন অপরবিদ্বেষী জাতিগর্বের অসারতার কথা। বলেছেন, সকল দেশের সকল ধর্মের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ মানুষের চিরকালীন অভিযাত্রায় মিলিত হয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বলার জন্য প্রশংসার চেয়ে বেশি নিন্দিত, সমালোচিত হয়েছেন তিনি। কিন্তু তারপরও অচঞ্চলভাবে লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন। নোবেল পুরস্কার পাওয়ার খ্যাতি তাঁকে যে সুযোগ এনে দিয়েছিল দেশে দেশে মানুষের কাছে পৌঁছে নিজের কথা বলার সেই সুযোগ তিনি পরিপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। আবার তিনিই দেখিয়েছেন সরকারের দেওয়া পুরস্কার ত্যাগ করাও প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠতে পারে, যা নিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারেন অসহায়, নির্যাতিত দেশবাসীর পাশে।

৮০-র দশকে 'জলপাই রঙের অন্ধকার' বইতে হুমায়ুন আজাদ লিখেছিলেন— ''রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে বাতিলের চেষ্টা করে আসছে নষ্টরা পবিত্র পাকিস্তানের কাল থেকে; পেরে ওঠেনি। এমনি প্রতিভা ঐ কবির তাঁকে বেতার থেকে বাদ দিলে তিনি জাতির হৃদয় জুড়ে বাজেন; তাঁকে পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দিলে জাতির হৃদয়ের কাব্যগ্রন্থে মুদ্রিত হয়ে যান।... তাঁকে মাটি থেকে বহিষ্কার করা হলে তিনি আকাশ হয়ে ওঠেন; জীবন থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হলে তিনি রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেন জাতির স্বপ্নলোকে।'' আজকের বাংলাদেশই হোক বা ভারতই হোক রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করা চলছেই, কারণ, অত্যাচারীরা, অন্যায়কারীরা, ধর্মান্ধরা রবীন্দ্রনাথকে ভয় পায়। তাই পশ্চিমবঙ্গের অভয়ারা বা তামান্নারা হোক, বা প্যালেস্টাইন, লেবাননের শিশুরা হোক সবার জন্য ন্যায়বিচার চাইবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে ''আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে'' আমাদের হৃদয়ে জাগরূক রাখার দায়িত্ব নিতেই হবে। □

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রাজ্য কাউন্সিল সভার আহ্বান

উল্লেখযোগ্য। দেশে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের প্রতিবাদে যুদ্ধ উন্মাদনার আবহে সর্বভারতীয় ধর্মঘট পুনর্নির্ধারিত হয়ে ৯ জুলাই স্থির হয়। ২-৩ জুন, ২০২৫ সর্বোচ্চ বিচারালয়ের নির্দেশক্রমে বকেয়া মহার্ঘভাতার ২৫ শতাংশ প্রদান, রাজ্য পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিককে শাসকদলের নেতৃত্বের অশালীন আক্রমণ, মন্তেশ্বর ব্লকের জনপ্রতিনিধি দ্বারা আক্রান্ত কর্তব্যরত সরকারী কর্মচারী এবং দেশে যুদ্ধ উন্মাদনার আবহে রাজ্য কর্মচারীদের ছুটি বাতিলের আদেশনামা প্রত্যাহারের দাবিতে সারা রাজ্যব্যাপী প্রতিবাদ সভা সংগঠিত করা হয়। ধারাবাহিক সংগ্রাম ও একাধিক প্রতিবাদপত্র প্রেরণের ফলে রাজ্য সরকার ছুটি বাতিলের আদেশনামা স্থগিত করতে বাধ্য হয়। যৌথ মঞ্চের আহ্বানে ৩ ঘণ্টা ব্যাপী অবস্থান কর্মসূচীতে অর্জিত অধিকার হরণের প্রতিবাদে সারা রাজ্য জুড়ে ২৪ জুন, ২০২৫ তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। কলকাতায় কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর পার্শ্ববর্তী স্থানে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্ত পেনশনার্স সহ যৌথ মঞ্চের সুবিশাল অবস্থান বিক্ষোভ সভা থেকে ৪ জুলাই, ২০২৫ দু'ঘণ্টার (দুপুর ২টা থেকে বিকেল ৪টা) 'পেন ডাউন'-এর সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। গোটা রাজ্য জুড়ে যৌথ মঞ্চের আহ্বানে যৌথ আন্দোলনের মাধ্যমে আগামী ৯ জুলাই সর্বভারতীয় ধর্মঘটের সমর্থনে নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করা সম্ভব হয়। ৩০ জুন, ২০২৫ বেতন কমিশনের রিপোর্টে রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের সর্বভারতীয় মূল্য সূচকের নিরিখে কেন্দ্রীয় হারে মহার্ঘভাতা পাওয়ার অধিকারকে অগ্রাহ্য করে মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারের ইচ্ছাধীন—এই মর্মে সুপারিশের প্রতিবাদে দপ্তরে দপ্তরে বিক্ষোভ সভার মাধ্যমে ৪ জুলাই '২৫ 'পেন ডাউন' কর্মসূচীর প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

আগামী কর্মসূচী প্রসঙ্গে প্রস্তাবনা করতে গিয়ে তিনি বলেন পূর্ব পরিকল্পনা গ্রহণ করে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে ২০২৫ বর্ষের সদস্যভুক্তি দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। এই সাংগঠনিক দায়িত্ব রূপায়ণে সংগঠন ও সমিতির যৌথ নেতৃত্বদের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করেই একাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। জেলা সফর প্রসঙ্গে তিনি বলেন বহুমাত্রিক আক্রমণকে প্রতিহত করতে সর্বস্তরের কর্মচারীদের সংগঠনের পতাকাতলে আনতে কর্মক্ষেত্র থেকে আন্দোলন সংগঠিত করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রয়োজন ব্লক স্তর পর্যন্ত যোগাযোগ বৃদ্ধি করা। এ কাজ পূর্ণমাত্রায় রূপায়ণ করতে জেলা কো-অর্ডিনেশন কমিটির সহযোগিতায় রাজ্যভিত্তিক সমিতির ব্লকস্তর পর্যন্ত সফরসূচীর যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা কয়েকটি সমিতি গুরুত্ব সহকারে প্রতিপালন করেছেন। এই প্রচেষ্টার ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে।

বৃহত্তর আন্দোলনের কর্মসূচী প্রসঙ্গে তিনি বলেন কর্পোরেট স্বার্থবাহী কেন্দ্রীয় সরকার দেশের জনগণকে উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনায় লিপ্ত করার কৌশল গ্রহণ করে জনগণের স্বার্থ হরণকারী শ্রমকোড কার্যকর করতে উদ্যত। এর বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনসমূহের আহ্বানে আগামী ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের নতুন ইতিহাস রচনা করবে। এই সর্বভারতীয় ধর্মঘটের প্রতি পূর্ণ সংহতি জানিয়ে রাজ্যের কর্মচারীদের আর্থিক বঞ্চনার প্রতিবাদে ও অর্জিত গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সংগ্রামের নতুন ইতিহাস রচনা করতে হবে। ধর্মঘটের সমর্থনে আগামী ৭ জুলাই কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও ১২ই জুলাই কমিটির আহ্বানে মহামিছিল সংগঠিত হবে কেন্দ্রীয়ভাবে ধর্মতলা থেকে শিয়ালদহ বিগবাজার পর্যন্ত। এই মিছিলে বৃহত্তর জমায়েতের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৯ জুলাই বিকাল ৪টায় অভয়া মঞ্চের আহ্বানে মৌলালী থেকে রাজাবাজার পর্যন্ত মিছিল সংগঠিত হবে। এই কেন্দ্রীয় মিছিলে কলকাতার কর্মী নেতৃত্বদের যুক্ত হতে হবে। শিক্ষামূলক কর্মসূচী ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর প্রস্তাবনা করে তিনি বলেন আগামী ১৫ আগস্ট, ২০২৫ যথাযথ মর্যাদায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন সহ ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপন করতে হবে। চুক্তিভিত্তিক কর্মচারীদের বিষয়ে করণীয় প্রসঙ্গে বিগত রাজ্য কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত রূপায়ণের প্রশ্নে তিনি বলেন এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সমিতিগুলিকে দ্রুত কার্যকরী ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। সদস্যপদ প্রদানে সমিতির নিয়মাবলী পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে তা করতে হবে। বিভিন্ন সমিতির সংযুক্তিকরণ, ফ্রি কোচিং সেন্টার, সোশ্যাল মিডিয়া বিষয়ে করণীয় সহ অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনের স্থান, তারিখ ও উদ্বোধকের নাম সহ রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির আসন্ন একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনের বিষয়ে তিনি বিস্তৃত আলোচনা করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির ব্লক, মহকুমা ও জেলা সম্মেলনের নির্দিষ্ট সময়সূচী যা বিগত কাউন্সিল সভা থেকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল তা পুনরায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন উদ্যোগে, নতুন উদ্যমে আগামী দিনের আন্দোলন সংগ্রাম ও কঠিন লড়াইয়ের জন্য সর্বস্তরের সাংগঠনিক কাঠামো পুনর্গঠন করতে হবে। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে নগর ও মঞ্চের নামকরণের প্রস্তাবনা করতে গিয়ে তিনি বলেন কমরেড প্রণব চট্টোপাধ্যায় নগর, কমরেড প্রশান্ত সাহা নামাঙ্কিত মঞ্চে রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। রাজ্য সম্মেলনকে কেন্দ্র করে সংগঠিত প্রগতিশীল পুস্তক বিপণন কেন্দ্র কমরেড অভিজিৎ দাস-এর নামাঙ্কিত হবে। এছাড়া বিশিষ্ট অভিনেতা প্রয়াত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও কমরেড তরুণ ভট্টাচার্যর নামে রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে তোরণ নির্মিত হবে। রাজ্য সম্মেলনকে সফল করার লক্ষ্যে তহবিল সংগ্রহ এবং বিশেষ সংখ্যা 'সংগ্রামী হাতিয়ার' পত্রিকার বিজ্ঞাপন সংগ্রহে প্রতিটি সমিতি, অঞ্চল ও জেলাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। এছাড়াও সংগঠনের পত্র-পত্রিকার গ্রাহকভুক্তির আহ্বান সহ সংগঠনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ও ষষ্ঠ বেতন কমিশন সংক্রান্ত সাংগঠনিক করণীয় বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন। সর্বশেষ সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্মসূচী হিসাবে তিনি ১২ই জুলাই কমিটির ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবসের দিন কর্মচারী ভবনে কেন্দ্রীয় রক্তদান শিবির ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরকে সফল করতে অঞ্চল ও সমিতির নেতৃত্বদের সর্বোচ্চ সাংগঠনিক উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।

সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনাকে সমৃদ্ধ করে উপস্থিত জেলা, অঞ্চল ও সহযোগী সমিতির পক্ষ থেকে ২৯ জন বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে সমিতি ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির যৌথ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে কর্মচারীর মনোজগতে প্রবেশ করার প্রচেষ্টা জারি রাখার আহ্বান মূল সুর হিসাবে ধ্বনিত হয়। একই সঙ্গে কিছু বিষয়ে আইনি পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার কথাও তাঁদের আলোচনায় উঠে আসে।

সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়িত করে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রিয় যুগ্ম সম্পাদক দেবব্রত রায় তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই কবি ও গবেষক তুষার হাসানের বক্তব্যকে উদ্ধৃত করে বলেন ''পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, তা খাদ্যের নয়—অভ্যাস, স্বভাব ও আদর্শের দুর্ভিক্ষ।'' পরিস্থিতি দাবি করছে আজকের দিনে সংগঠন পরিচালনা করতে গেলে আমাদের Social Scientist-এর ভূমিকা প্রতিপালন করতে হবে। এত আক্রমণ, এত লুঠ সত্ত্বেও চারিদিকে এক নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। সংগঠন পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু ক্ষেত্রে দুর্বলতা, জনবিচ্ছিন্নতা চিহ্নিত হয়েছে, একে অতিক্রম করে আমাদের এগোতে হবে। কর্মচারী বন্ধুদের সঙ্গে জীবন্ত যোগাযোগ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে, গভীরতম সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আরও যত্নবান হতে হবে। PSC-র স্বাধিকার খর্ব করা, Detailment-এর বিরুদ্ধে লড়াই জারি থাকবে। আইন বিষয়ে চর্চা আমাদের বহুদিন থেকেই রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য থাকবে আইন বিষয়ে পরামর্শ নেওয়ার, তবে রাস্তার লড়াই আরও জোরদার করতে হবে। চুক্তি প্রথায় কর্মরত কর্মচারীদের সংগঠিত করা ও তাঁদের দাবিতে আমাদের আন্দোলনের বার্তা নিয়ে চুক্তিতে নিযুক্ত সমস্ত কর্মচারীদের কাছে পৌঁছাতে হবে। আগামীর বৃহত্তর লড়াই, নিয়োগকর্তা নির্বাচনের প্রশ্নে আমাদের সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করে তার সফল রূপায়ণ। বিভিন্ন সমিতির রাজ্য সম্মেলনগুলি যেমন অনুষ্ঠিত হবে, একই সঙ্গে রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির একবিংশতিতম রাজ্য সম্মেলন পর্বে আমরা প্রবেশ করব। রাজ্য সম্মেলনের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র কাঠামোর পুনর্গঠন ও নেতৃত্ব নির্বাচন নয়, কত বেশি বেশি কর্মচারীকে সম্মেলন পর্বে যুক্ত করতে পারলাম, কতজন নবীন নেতৃত্বকে যুক্ত করতে পারলাম, তার সাংগঠনিক অডিট প্রয়োজন। ব্লক ইউনিট স্তর থেকে দাবি উঠবে, আলোচনা হবে, পর্যালোচনা হবে, পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

প্রশাসনের অভ্যন্তরে লুম্পেনরাজ চলছে। চেতনায় শান দিয়ে, মগজাস্ত্রে শান দিয়ে, সাহসিকতার সঙ্গে একে মোকাবিলা করতে হবে। পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী আমাদের কর্মী নেতৃত্বদের শ্রেষ্ঠ ভূমিকা, তেজী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। আন্দোলনের ধারাবাহিকতা ও দৃশ্যমানতার প্রশ্নে আমাদের আরও বেশি বেশি নতুন নতুন বন্ধুদের যুক্ত করতে হবে যার অবয়ব বন্ধুর বুকে সাহস যোগাবে, শ্রেণী শত্রুর বুকে কাঁপন ধরাবে। আমার যন্ত্রণা, আমার লড়াই, আমার প্রতিবাদে নিজ নিজ পরিবারকে শরিক করতে হবে। সামাজিক আন্দোলনেও আরও বেশি বেশি করে সদস্য বন্ধুদের পরিবারকে যুক্ত করতে হবে। শ্রেণীশক্তির ভারসাম্যের পরিবর্তনের লড়াইতে নিজ পরিবার ও বৃহত্তর পরিবারকে যুক্ত করতে হবে। সমস্ত প্রতিকূলতাকে ভেদ করে চ্যালেঞ্জ নিয়েই নিয়োগ কর্তা নির্ধারণের সংগ্রামে আগামী দিনে সংগঠন-সংগ্রাম-আন্দোলন পরিচালনা করতে হবে। সাধারণ সম্পাদকের প্রস্তাবনা, উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের আলোচনা ও যুগ্ম সম্পাদকের সমগ্র আলোচনাকে সূত্রায়ন ও উপস্থিত কাউন্সিল সদস্যদের একে সমর্থনের পরবর্তীতে সভাপতিমণ্ডলীর পক্ষ থেকে কাউন্সিল সভার সমাপ্তি ঘোষিত হয়। □

দেবাশীষ রায়

চতুর্থ পৃষ্ঠার পরে

প্রসঙ্গ ঃ সর্বোচ্চ আদালতের দুটি তাৎপর্যপূর্ণ রায়

ধরে। উর্দু ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশের ধারা সংক্রান্ত প্রকৃত ইতিহাস বিভিন্ন ভাষাতত্ত্ববিদ ও পণ্ডিতবর্গ ব্যাখ্যা করেছেন। যা থেকে সত্যটা উদ্‌ঘাটিত হয়। উর্দুর জন্ম ইন্দো-ইউরোপিয়ান ভাষা পরিবার থেকে। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন এই ভাষাটি দেশের মাটিতে দ্বাদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে বিকশিত হয়েছে মূল ভাষা সংস্কৃত থেকে। আবার অনেকের মত হল এটা ব্রজভাষার মতো উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোনো আঞ্চলিক ভাষার সহদর হিসাবে এসেছে। এই ভাষার মাধুর্য হল এটি পারসী, আরবী এবং তুর্কী শব্দাবলীর দ্বারা সমৃদ্ধ করেছে নিজেকে। কিন্তু এটা ঘটাতে গিয়ে ভাষাটি তার ভারতীয়ত্ব হারায়নি। সুপ্রিম কোর্টের উল্লিখিত নির্দেশ এই বিষয়টি পরিষ্কার করেছে যে আমাদের সংবিধানে মারাঠী ভাষা এবং উর্দু ভাষা সমমর্যাদাসম্পন্ন। বর্তমানে হিন্দুত্ববাদী শক্তিদের যে মূল ভাষ্য, যে হিন্দি হচ্ছে হিন্দুদের ভাষা, আর উর্দু হচ্ছে মুসলিমদের ভাষা, তাকে নস্যাৎ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সর্বোচ্চ আদালত এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার উদ্ভবের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনকে দায়ী করে বলেছে ''The truth is that religion has no language, and language has no religion.''

মানুষের মনের ভাবের কথ্য বহিঃপ্রকাশ থেকেই ভাষার উদ্ভব। অন্য সব ভাষার মতো উর্দু ভাষাও সেভাবেই সৃষ্টি হয়েছে। উর্দু লেখকদের সবাই একটি নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী নন। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় মুন্সী প্রেমচাঁদ, আনন্দ মুলা, রঘুপতি সহায়, ফিরাক গোরখপুরী, এরা কেউ মুসলিম ছিলেন না। আবার সাহির লুধিয়ানাভি, আলি সরদার জাফরি বা কায়ফি আজমি এঁরা সবাই ইসলামী পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও নাস্তিক ছিলেন। দেশের অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক স্লোগান 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ'-এর জন্ম হয়েছে উর্দুর গর্ভ থেকেই।

দেশের সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলি উর্দুর মতো একটি জনপ্রিয় ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের সাথে সংযুক্ত করে তাদের রাজনীতি যখন চরিতার্থ করতে চাইছে তখন সর্বোচ্চ আদালতের নিজস্ব রায় অত্যন্ত ইতিবাচক। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের নির্যাস উৎসাহিত করবে মৌলবাদের বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির লড়াইকে। □

১২ই জুলাই কমিটির ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস

শ্রমিক-কর্মচারী-শিক্ষক যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস ও হীরক জয়ন্তী বর্ষের সূচনা উপলক্ষে ''ধর্মীয় মৌলবাদের জঠরে জন্ম নেয় সন্ত্রাসবাদ'' বিষয়ক একটি আলোচনা সভা ১৭ জুলাই, ২০২৫, সুবর্ণ বণিক সমাজ হলে অনুষ্ঠিত হয়। আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখতে গিয়ে ১২ই জুলাই কমিটির অপর যুগ্ম আহ্বায়ক সুমিত ভট্টাচার্য বলেন ষাটের দশকে এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল শ্রমিক-কর্মচারী- শিক্ষক যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ ১২ই জুলাই কমিটির। যা গোটা দেশের যুক্ত আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক বিরল ঘটনা। জন্মলগ্ন থেকেই শুধুমাত্র যৌথ আন্দোলনের ক্ষেত্রে নয়, অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠন যখন নিজ দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত করেছে তখন অপরাপর সংগঠন সেই আন্দোলনের সংহতিতে পথে নেমেছে। ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলনের গৌরবোজ্জ্বল পথ বেয়ে যুক্ত আন্দোলনের মঞ্চ আজ ষাট বছরে পদার্পণ করেছে। আজকেরও সময়ের চাহিদা যূথবদ্ধতা, যৌথ আন্দোলন। ঐক্যবদ্ধ কৃষক আন্দোলন ভারতবর্ষের যৌথ আন্দোলনে এক নয়া ইতিহাস রচনা করেছে, যেখানে ধনী কৃষক থেকে একেবারে দরিদ্র কৃষক দলমত নির্বিশেষে, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কিষান মোর্চা গঠন করে দেশের সরকারকে বাধ্য করেছেন তাঁদের দাবি মানতে। অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সংগঠনের নিজ নিজ লড়াই থাকবে কিন্তু আজকে যখন একক সংগঠনের ক্ষয় ঘটছে তখন আরও বেশি বেশি করে যৌথ আন্দোলনকে শক্তিশালী করা আমাদের মূল দায়িত্ব।

আলোচনা সভার আলোচক অধ্যাপক ডঃ শ্যামল চক্রবর্তী ''ধর্মীয় মৌলবাদের জঠরে জন্ম নেয় সন্ত্রাসবাদ'' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য নিবেদন করতে গিয়ে বলেন, আমাদের প্রথমেই এটা মাথায় রাখা প্রয়োজন, যে সময়ে আমাদের যে বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন আমরা তা করেছিলাম, না নীরব দর্শকের ভূমিকা প্রতিপালন করেছিলাম। মানুষের হাতেই ধর্ম তৈরী হয়েছে কিন্তু ধর্মকে বিভাজনের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। ঈশ্বর যদি মানুষ সৃষ্টি করে থাকেন তাহলে শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণপ্রতিষ্ঠা মানুষ কি করে করে! একদিকে রামমন্দির তৈরী, অপরদিকে দীঘায় জগন্নাথ মন্দির—এটা আজকে সরকারের অগ্রাধিকার। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন ১৯২৫ সালে আমাদের দেশে একটি সংগঠন তৈরী হয়েছিল। জন্মলগ্ন থেকেই যাদের ঘোষিত নীতি ভারতবর্ষকে হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করা। তাদের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে তারা NCERT-র পাঠক্রম থেকে ডারউইনবাদ ও মেন্ডেলিজমকে বাদ দিয়েছে, মুঘলযুগকে বর্ণনা করা হচ্ছে 'ক্রুর, নিষ্ঠুর' যুগ হিসাবে। কিন্তু আমাদের ভাবতে হবে, মুঘলদের প্রায় তিনশো বছরের শাসনকালে তাঁরা যদি চাইতেন তাহলে হিন্দুধর্ম বর্তমান অবস্থায় থাকত কি? তুলসীদাস রামায়ণ রচনা করেছেন মুঘল শাসনকালে, আর এস এস ভাষ্যর সত্যতা তাহলে থাকছে কি? সংখ্যাগুরুর মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িকতা সংখ্যালঘুদের সাম্প্রদায়িকতার থেকে ভয়ঙ্কর। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা কখনোই সংখ্যালঘুর সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। ধর্মীয় মৌলবাদ ও সন্ত্রাসবাদ একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্র পরিচালকদের মতাদর্শ 'যদি হয়' সমস্ত রাজনীতিকে হিন্দুকরণ করে হিন্দুত্ববাদকে সামরিকীকরণ করো তাহলে একে রুখতে আমাদের প্রতিদিন-প্রতিনিয়ত নিজ মতাদর্শের চর্চা বাড়াতে হবে। চোখ-কান খোলা রেখে যুক্তিবাদে বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞানমনস্কতায় জোর দিতে হবে। অনুষ্ঠানের শুরুতে গণসঙ্গীত পরিবেশন করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক টিম। □

দেবাশীষ রায়

প্রশাসনিক বাধা উপেক্ষা করেই ধর্মঘট করলেন রাজ্যের শ্রমিক-কৃষক-কর্মচারীবৃন্দ

দেশের বিজেপি ও রাজ্যের তৃণমূল সরকারের শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী ও জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ সংগঠিত করে সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্য জুড়ে সমগ্র অংশের শ্রমজীবী মানুষ কার্যত লড়াই ঘোষণা করলেন, গত ৯ জুলাই। রাজ্যের তৃণমূল সরকার নিজেদের দুর্নীতিকে আড়াল করার প্রয়াস জারি রেখে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তোষণ করার লক্ষ্যে ধর্মঘট বানচাল করতে সব ধরনের প্রশাসনিক পন্থা প্রয়োগ করে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করে ধর্মঘটীদের ওপর নানাভাবে বাধা ও আক্রমণ নামিয়ে আনে, কোনো কোনো জায়গায় অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তারও করে এই দলদাস পুলিশ। কিন্তু রাজ্যের সর্বত্র এই অপচেষ্টা, বাধা, আক্রমণকে প্রতিহত করেই রাজ্যের শ্রমজীবী ও প্রতিবাদী মানুষ রাস্তায় নেমে সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করে তুলেছেন।

রাজ্যের একটি বড় অংশে চা শ্রমিক, প্রায় ৯২ শতাংশ চটকল শ্রমিক কাজে না গিয়ে ধর্মঘটে অংশ নিয়েছেন। ধর্মঘটের প্রভাব পড়েছে কয়লাখনি অঞ্চলে, ব্যাঙ্ক, বীমা, বিদ্যুৎ সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে। ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন প্রকল্প কর্মী, হকার, শিল্প শ্রমিক সহ ক্ষুদ্র শিল্প শ্রমিকরাও। পরিবহন ক্ষেত্রেও ধর্মঘটের প্রভাব স্পষ্ট হয়েছে। কলকাতা এবং হলদিয়া বন্দরে ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ধর্মঘটীদের দাবি দেশ ও রাজ্যের মানুষকে বাঁচাতে স্থায়ী কর্মসংস্থানের নিশ্চিত অধিকার। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি আইন। শ্রমকোড বাতিল। কার্যত ধর্মঘট বানচাল করতে এদিন শাসকদলের দুষ্কৃতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে পথে নেমেছে রাজ্যের পুলিশ। ব্যাপক মারধর করেছে, গ্রেপ্তার করেছে। যা চূড়ান্ত অনৈতিক। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জনগণকে ধাপ্পা দিয়ে বলছেন, আমরা শ্রমকোডের বিরোধী।

এদিনের ধর্মঘটে অংশ নিয়েছিল রাজ্যের কৃষক সংগঠনগুলি। কৃষক সমাজের দাবি রেগা প্রকল্পে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ফের কাজ চালু করে অবিলম্বে সমস্ত বকেয়া মজুরি মেটাতে হবে। বছরে ১০০ দিনের পরিবর্তে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৬০০ টাকা মজুরি চালু করতে হবে। ফসলের সহায়ক মূল্য দিতে হবে। সামাজিক সুরক্ষা ও বিধিগুলি সঙ্কুচিত বা বাতিল করার নীতি সরকার গ্রহণ করেছে, তা খারিজ করতে হবে।

এদিনের রাজ্যের সর্বত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের শ্রমিক, কৃষক বিরোধী নীতির পাশাপাশি কেন্দ্রের জনবিরোধী ও দেশবিরোধী এবং কর্পোরেট তোষণ নীতির বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন মানুষ। গোটা দেশের সাথে এ রাজ্যের শ্রমজীবী ও সাধারণ মানুষ, কৃষক, খেতমজুর, ছাত্র, যুব, মহিলা, আইনজীবী, কর্মচারী সহ সমস্ত অংশের মানুষ ধর্মঘটকে সফল করতে পথে নামেন।

আসানসোল-দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলে দফায় দফায় বিক্ষোভ ছড়িয়েছে, প্রতিবাদে বিক্ষোভ সভাও হয়েছে।

এদিন শ্রমজীবীদের ডাকা সাধারণ ধর্মঘটে শামিল ছিলেন হাজার হাজার ছাত্র-যুব। এ জন্য শতাধিক এস এফ আই নেতা, সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ ও তৃণমূলীদের এই ধরনের হামলা সত্ত্বেও ছাত্র যুবদের দমন করা যায়নি।

সাধারণ ধর্মঘটে সমস্ত শ্রমিক অংশগ্রহণ করার ফলে হাওড়ার ফোর্ট উইলিয়াম জুট মিল, হুগলির শক্তিগড়ে টেক্সটাইল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড ও অ্যাঙ্গাস জুট মিল এবং কলকাতার ব্রাবোর্ন রোডে আর ডি বি টেক্সটাইল লিমিটেড প্রভৃতি কারখানা চালু রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করতে না পেরে কর্তৃপক্ষ নিজেরাই সংশ্লিষ্ট কারখানাগুলি বন্ধ রাখার কথা ঘোষণা করে নোটিশ ঝুলিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

এদিন কলকাতা জুড়ে এলাকায় এলাকায় ধর্মঘটের কমবেশি প্রভাব লক্ষ করা গেছে। সকাল থেকেই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘটের সমর্থনে পথে নামেন বামপন্থী কর্মীরা। এলাকায় এলাকায় ধর্মঘটের সমর্থনে মিছিল, পিকেটিং, পথ অবরোধে শামিল হন হাজার হাজার মানুষ। এদিন কলকাতার বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট ভাঙতে অতি তৎপর হতে দেখা যায় রাজ্য সরকারের পুলিশকে। এই হামলা-বাধা সত্ত্বেও এদিন সাধারণ ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের বার্তা দিয়েছেন শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ।

এদিনের ধর্মঘট মেহনতী মানুষের হুঁশিয়ারির ধর্মঘট। মোদি সরকারের দেশবিরোধী-জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মেহনতী মানুষের তীব্র প্রতিবাদেই এই ধর্মঘট। □

আশিস মিত্র

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

৯ জুলাই সাধারণ ধর্মঘটে দেশব্যাপী অভূতপূর্ব সাড়া

সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষের উপরেই যে কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির মারাত্মক প্রভাব পড়েছে এটাই তার জলজ্যান্ত প্রমাণ। শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, ইউনিয়নের অধিকার, ৮ ঘণ্টা কাজ এবং শ্রম কোড বাতিলের দাবির সঙ্গে মিশে গেছে কৃষকদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি অধিকার থেকে কৃষি বিপণনের নতুন নীতি কাঠামো বাতিলের দাবি। একই ভাবে রেগা কর্মীদের মজুরি বৃদ্ধি কিংবা খেতমজুরদের মাসে ১০ হাজার টাকা ভাতার দাবির সঙ্গে মিশে গেছে স্মার্ট মিটারের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষের তীব্র বিরোধিতা। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কোথাও বিক্ষোভ মিছিল, কোথাও প্রতিবাদী সমাবেশ, রেল বা রাস্তা অবরোধ, কর্মবিরতি কিংবা ধর্মঘটে অংশ না নিয়েও তার প্রতি সক্রিয় সমর্থনের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়েছে ধর্মঘট।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রধান শিল্পাঞ্চলগুলির স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার বেনজির চিত্র চোখে পড়েছে এই ধর্মঘটে। উল্লেখযোগ্যভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন বড় শহরের বহুজাতিক সংস্থার কর্মীরাও নির্ভীকভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যে এর আগে সচরাচর ধর্মঘটের প্রতি এইরকম সমর্থন লক্ষ করা যায়নি। বেশির ভাগ রাজ্যের তালুক, তহসিল এমনকি গ্রাম স্তরেও ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন সাধারণ মানুষ। দেশের অন্তত ৫০০টি জেলায় ধর্মঘটের বিপুল প্রভাব লক্ষ করা গেছে। কয়লা ক্ষেত্রে ধর্মঘটের প্রভাব সর্বাত্মক এবং দেশের প্রায় ১০০ শতাংশ কয়লা শ্রমিক ধর্মঘটকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন করেছেন। দেশের সমস্ত লাভজনক ক্ষেত্রের কর্পোরেট অধিগ্রহণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার যে 'ন্যাশনাল মনিটাইজেশন পাইপলাইন' প্রকল্প চালু করেছে, তারই আওতায় কয়লা খনিগুলোতে আনা হয়েছে 'মাইন ডেভেলাপার অ্যান্ড অপারেটর মডেল'। এর মাধ্যমে সরকারী কয়লা খনির বেশ কিছু অংশে ঠিকাদারিকে বাস্তবায়িত করার চক্রান্ত চলছে। এর ফলে স্থায়ী শ্রমিকদের অস্থায়ীকরণ বৃদ্ধি পাবে। এই সঙ্কটের মুখে দাঁড়িয়ে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের মতো বিভিন্ন রাজ্যের কয়লা খনিগুলোর প্রায় সমস্ত শ্রমিক ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। কয়লা খনি বাদে অন্যান্য খনিজ ক্ষেত্রেও ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের শ্রমিকরাও প্রায় সমস্ত রাজ্যেই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। উত্তর-পূর্ব ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিদ্যুৎ শ্রমিকরা ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নামেন। বিদ্যুৎ ক্ষেত্রের ঢালাও বেসরকারীকরণের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের ক্ষোভ এই ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। বেসরকারী মালিকানার উপাদান হিসেবে বাড়ি বাড়ি স্মার্ট মিটার বসিয়ে বিদ্যুৎ বিল বাড়ানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন বিদ্যুৎ ভোক্তারা। সম্প্রতি চন্ডিগড়ের বিদ্যুৎ বণ্টনের ঠিকা এক বেসরকারী সংস্থাকে দেওয়ার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ওই শহরের প্রায় ১০০ শতাংশ বিদ্যুৎ শ্রমিক ধর্মঘট পালন করেছেন।

ইস্পাত, ব্যাঙ্ক, বীমা, পোস্ট অফিস, গ্রামীণ ডাক সেবক, টেলিকম, পরমাণু কেন্দ্র, জ্বালানি তেল, সিমেন্ট, বন্দর, বাগিচা, পাট কল, বস্ত্র শিল্প, গণপরিবহন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ধর্মঘটে বিপুল সাড়া পাওয়া গেছে। ধর্মঘটে কার্যত অচল হয়ে যায় আর্থিক ক্ষেত্র। ব্যাঙ্ক ও বীমার মতো গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী পরিষেবার ক্ষেত্রেও ধর্মঘটের ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। ডাক, আয়কর, অডিট সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসের কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছেন। বেঙ্গালুরু সহ বিভিন্ন শহরে ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন তথ্য প্রযুক্তি শ্রমিকদের বড় অংশ। বিভিন্ন রাজ্যে মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভরা ধর্মঘটের সমর্থনে কর্মবিরতি পালন করেছেন। ধর্মঘট ও প্রতিবাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই দেশজুড়ে কারখানার গেটের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। সরকারের খবরদারি উপেক্ষা করেই রেল শ্রমিকদের বিক্ষোভে গোটা দেশে প্রভাব পড়েছে। সংগঠিত ক্ষেত্রের পাশাপাশি অসংগঠিত ক্ষেত্রেও ধর্মঘট পালিত হয়েছে। বিভিন্ন রাজ্যে রেগা, অঙ্গনওয়াড়ি, আশা, মিড ডে মিল সহ বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের কর্মীরা ধর্মঘটের দিন তুমুল বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। পাশাপাশি বিড়ি শ্রমিক, নির্মাণ শ্রমিক, মৎস্যজীবী, গৃহ পরিচারক ও পরিচারিকা, হকার-ভেন্ডার, মুটে, ডেলিভারি অ্যাপের শ্রমিক, ঘরোয়া ক্ষেত্রের শ্রমিক, রিকশা চালক, অটো ও ট্যাক্সি চালকরা ধর্মঘটের সমর্থনে রাস্তায় নেমেছেন। দেশের বিভিন্ন শহরে ওলা, উবের, র‍্যাপিডো সহ বিভিন্ন অ্যাপ ক্যাব চালকরাও ধর্মঘটে ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

দেশের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রমিকদের ডাকা ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়ে বিক্ষোভ দেখায় বিভিন্ন বাম ছাত্র, যুব ও মহিলা সংগঠন। বিক্ষোভ মিছিলে অংশ নেয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বন্‌ধের পরিস্থিতি তৈরী হয়। স্তব্ধ হয় স্বাভাবিক জনজীবন। পুদুচেরি, আসাম, বিহার, ঝাড়খন্ড, তামিলনাড়ু, পাঞ্জাব, কেরালা, ওড়িশা, কর্ণাটক, গোয়া, মেঘালয় ও মণিপুরের মতো রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পুরোদমে বন্‌ধ পালিত হয়। রাজস্থান, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা, আন্দামান ও অন্ধ্র প্রদেশের মতো রাজ্যেও বন্‌ধের প্রভাব পড়ে। মধ্য প্রদেশ, মহারাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ও গুজরাটের বিভিন্ন কারখানা ও দপ্তরে ধর্মঘটের ফলে কাজ বন্ধ থাকে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রাজ্য গুজরাটে এবারের ধর্মঘটে বেনজির সাড়া পাওয়া গেছে। মোদীর 'গুজরাট মডেল'-কে পরাস্ত করে রাজ্যের অন্তত ২৩টি জেলায় পুরোদমে ধর্মঘট পালিত হয়েছে। সেখানে রেগা, মিড ডে মিল, অঙ্গনওয়াড়ি, আশা সহ বিভিন্ন সরকারী প্রকল্পের কর্মীরা সক্রিয় প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করেছেন। আবার ধর্মঘটে অংশ না নিয়েও কর্মক্ষেত্রে নানা অভিনব রূপে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রের শ্রমিকরা।

ধর্মঘটের দিন শ্রমিকদের সমর্থনে দেশের বিভিন্ন তহসিল স্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সংযুক্ত কিষান মোর্চা ও খেতমজুর ইউনিয়নগুলির যৌথ মঞ্চ। তাদের বিক্ষোভ গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সাড়া ফেলে। কৃষক নেতারা বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য পাচ্ছেন না। উল্টে কৃষি বিপণনের জাতীয় নীতি কাঠামো প্রণয়নের মাধ্যমে কৃষকদের আরও বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। ২০১৩ সালের জমি অধিগ্রহণ ও ক্ষতিপূরণ আইনকে লঙ্ঘন করে বেআইনিভাবে কৃষি জমি দখল করে তা জলের দরে কর্পোরেট বা রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘটে শ্রমিক, কৃষক ও খেতমজুরদের মধ্যে তৈরী হওয়া বৃহত্তর ঐক্যে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সংযুক্ত কিষান মোর্চার নেতৃত্ব।

গত এক দশক ধরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ভারতীয় শ্রম সম্মেলন ডাকতে পারেনি। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য মালিকপক্ষকে আরও বেশি সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দিয়ে শ্রমিকদের আরও কোণঠাসা করা। গত ১৫০ বছর ধরে তুমুল লড়াই করে শ্রমিকরা যে অধিকার অর্জন করেছেন, তা বাতিল করে, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শ্রম বিধি লঙ্ঘন করে ৪টি শ্রম কোড পাশ করানো হয়েছে। গণপ্রতিরোধ ও জঙ্গি আন্দোলন ছাড়া এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মোকাবিলা করার আর কোনো উপায় নেই। ৯ জুলাইয়ের ধর্মঘটের মধ্যে দিয়ে সেই লড়াইয়ের সূচনা হলো। আগামীতে এই লড়াইকে আরও অর্থপূর্ণ ও দীর্ঘমেয়াদী করাই হবে লক্ষ্য। ধর্মঘটের পর বিবৃতি দিয়ে এই কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশন সমূহের নেতৃবৃন্দ। □

ইন্দ্রজিৎ রায় চৌধুরী

Editor : MANAS KUMAR BARUA
SANGRAMI HATIAR
State Co-ordination Committee
53rd Year, 3rd Edition, July, 2025
Regd. No. : 18484/71

প্রথম পৃষ্ঠার পরে

রক্তদান কর্মসূচী ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির

রক্তপাত ঘটায়। রক্তস্নান করাতে চায়। তারই ঠিক বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে মানুষের সেবায় আমরা রক্তদান করি। ১২ই জুলাই কমিটির প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি সকলকে শুভেচ্ছা জানান। ৬০-এর দশকে ১২ই জুলাই কমিটি গঠন ও তার আন্দোলন সংগ্রাম জনমানসে গভীর ছাপ রেখেছে। আজও সেই দায়িত্ব ১২ই জুলাই কমিটি নিষ্ঠার সাথে পালন করে চলেছে। সমস্ত নাগরিক আন্দোলনে আমরা আপনাদের আহ্বান করি। যৌথ মঞ্চ, যৌথ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সবাইকে কীভাবে একত্রিত করা যায় সেটা আপনাদের থেকে ভালো কেউ জানে না। তাই অভয়া মঞ্চের আন্দোলনে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। মানুষ যখন বিপদে পড়েন, তখন তাঁদের পাশে থাকার জন্য ঘরের দরজা খুলে যাঁরা বেরিয়ে আসেন তাঁদের মধ্যে আপনারা আছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার যেভাবে প্রতিহিংসামূলক বদলির নীতি গ্রহণ করেছে তাতে ডাক্তারবাবুরা

আক্রান্ত। একই সাথে আপনাদের নেতৃত্ব ও কর্মীরাও এই প্রতিহিংসামূলক বদলি নীতির শিকার। প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখার অপচেষ্টা। সরকারি দপ্তরে চুরি, স্বজনপোষণ আজ এমন একটা জায়গায় পৌঁছে গেছে যে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে। পুলিশ নির্লজ্জের মতো শাসকের নির্দেশ পালন করছে। নাগরিক সমাজ আতঙ্কিত, ভীত। কোনো কিছুর প্রতিবাদ করা যাবে না। সব কিছু মুখ বুজে সহ্য করতে হবে। অভয়ার বিচার আজও অধরা। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আজ ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে। সরকারী কর্মচারীদের বিপুল পরিমাণ মহার্ঘভাতা বকেয়া। ১০০ দিনের কাজ বন্ধ, স্কুল-কলেজ আজ আর ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে নিরাপদ জায়গা হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে না। গোটা রাজ্য জুড়ে এক অসহনীয় পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। এই অসহনীয় পরিস্থিতি থেকে আমাদের সকলকে নিস্তার পেতে হবে। আরো বেশি করে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে যৌথভাবে প্রান্তিক অংশের

মানুষের কাছে আমাদের পৌঁছোতে হবে। যাদের সাথে আমাদের একটা সময়ে রক্তের সম্পর্ক ছিল। কোনো কারণে সেই সম্পর্কে কিছুটা ফাটল ধরলেও

একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়নি। এইবারের ব্রিগেড সমাবেশ তার প্রমাণ। অর্জন করতে হবে তাদের

বিশ্বাস ও আস্থা। রক্তদানের মধ্যে দিয়েই রক্তের সেই সম্পর্ককে মজবুত করতে হবে। আপনাদের

সংগঠনের সেই ক্ষমতা আছে। আপনাদের লড়াই আন্দোলন অন্যদেরকে শানিত করে। আগামী দিনে যৌথ মঞ্চ ও যৌথ আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বক্তব্য শেষ করেন। এরপর নিউ টাউন নার্সিং হোমের পক্ষ থেকে জয়দীপ ঘোষ বক্তব্য উত্থাপন করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটি এই ধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য তিনি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির মতো একটা ঐতিহ্যশালী সংগঠনের সাথে সামাজিক কর্মসূচীতে যুক্ত হতে পেরে তাঁরা গর্বিত। পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য প্রকল্পের তাঁরা অনুমোদিত চিকিৎসা কেন্দ্র। তাঁদের প্রতিষ্ঠান থেকে সর্বোচ্চ চিকিৎসা পরিষেবা দিতে তাঁরা দায়বদ্ধ। আগামী দিনেও তাঁরা এই ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা সাধ্যমতো করার চেষ্টা করবেন। প্রত্যেক রক্তদাতাকে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানান।

এরপর রক্তদাতাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য রাখেন ১২ই জুলাই কমিটির অন্যতম যুগ্ম আহ্বায়ক মনোজ সাউ। তাঁকে পুষ্প স্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করেন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী। সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন সভাপতি মানস দাস। এরপর রক্তদাতাদের সাথে সাক্ষাৎ ও তাঁদের হাতে গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে অভিনন্দন জানান ডাঃ তমোনাশ চৌধুরী, বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী, দেবব্রত রায়, মনোজ সাউ, মানস দাস সহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দ। একই সাথে তাঁরা স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে উপস্থিত হয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে আসা মানুষদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে রোগ প্রতিরোধ সহ সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে পারব, এই প্রত্যাশা তাঁরা ব্যক্ত করেন। শিবিরে উপস্থিত স্বাস্থ্য কর্মীদের তাঁরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরে শতাধিক ব্যক্তি এই পরিষেবা গ্রহণ করেন ও রক্তদান শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেন। □

সোমনাথ পোদ্দার

খাদ্য দপ্তরের কর্মচারীদের জগন্নাথধামের মিষ্টির প্যাকেট বিলির প্রতিবাদে

মুখ্যসচিবের কাছে পত্র

স্মারক সংখ্যা ঃ কো-অর্ডি / ৬১/২৫ তারিখ ঃ ২৩/০৬/২০২৫

মাননীয়,
মুখ্য সচিব,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

মহাশয়,

আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে খাদ্য দপ্তরের প্রধান সচিবকে লেখা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দেওয়া পত্র নং—2006/Pr.Secy/ICA/25, তাং-১০.০৬.২০২৫ তারিখের পত্রের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। পত্রে ২০ জুন, ২০২৫ থেকে ০৪ জুলাই, ২০২৫-র মধ্যে দীঘার 'জগন্নাথ ধাম কালচারাল সেন্টার'-এর নামে একটি করে মিষ্টান্নের প্যাকেট 'স্মারক' হিসাবে 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের মাধ্যমে সামান্য কিছু অংশ বাদে রাজ্যের তামাম জনগণের কাছে বিলি করার ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়। গত ১৬ জুন, ২০২৫ রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত নির্দেশনামা (২৩১১/৩) অনুযায়ী 'দুয়ারে রেশন' প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্য দপ্তরের অধীনে থাকা সমস্ত ডিলার / ডিস্ট্রিবিউটরকে গোটা কর্মসূচীকে নির্বিঘ্নে সমাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কাজ সুষ্ঠভাবে করার জন্য ডিলার / ডিস্ট্রিবিউটরদের জেলা শাসকের পক্ষ থেকে নগদে 'সম্মান মূল্য' দিয়ে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যে এই কাজে রাজ্যের বিভিন্ন সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের করণ থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের যুক্ত করা হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নিরন্ন মানুষের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খাদ্য দপ্তরের প্রবর্তন করা হয়েছিল। স্বাধীনোত্তর কালে দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানকল্পে ও তারও পরবর্তীতে দেশের 'সবুজ বিপ্লব'-এর সুফল নাগরিকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে এই দপ্তরের বিস্তার ঘটানো হয়। অর্থাৎ এই দপ্তর এবং তার কর্মীরা চিরকালই মানুষের সেবায় নিয়োজিত থেকে বেঁচে থাকার পরিষেবা দিয়েছেন। উপরের কর্মসূচিটি কোনও ভাবেই খাদ্য দপ্তরের এই মহান ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় তো বটেই উপরন্তু সরকারি কোষাগারে গচ্ছিত জনগণের টাকার এ এক নিদারুণ অপচয় কারণ এর সাথে মানুষের জীবন ধারণের কোনও সম্পর্ক নেই।

এ প্রসঙ্গে আরও বলার দরকার যে, দেশের সংবিধান অনুযায়ী সরকারকে থাকতে হবে ধর্ম নিরপেক্ষ, অর্থাৎ সরকার নিজে কোনও ধর্ম পালন করবে না এবং কোনও ধর্মীয় পরিচিতি আছে, এমন কোনও বিষয়ে উৎসাহ দান বা অর্থ বরাদ্দ করবে না—আর ঠিক 'না করতে বলা' কাজটাই করা হচ্ছে উপরোক্ত ওই কর্মসূচির মাধ্যমে, যা কোনও মতেই সমর্থনযোগ্য নয় কারণ এটি সম্পূর্ণভাবে অনৈতিক।

এই ধরনের প্রশাসনিক কাজ বহিঃর্ভূত দায়িত্ব থেকে কর্মচারীদের বিরত রাখতে অনুরোধ রাখছি।

ধন্যবাদান্তে,

ইতি
ভবদীয়
বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী
(বিশ্বজিৎ গুপ্ত চৌধুরী)
সাধারণ সম্পাদক

৪ জুলাই রাজ্যে কর্মবিরতির কর্মসূচী

আলিপুরদুয়ার

হাইকোর্ট, কলকাতা

পূর্ব বর্ধমান

জগৎবল্লভপুর

হাওড়া

জলপাইগুড়ি

নবান্ন অভিযানের কিছু চিত্র

সম্পাদক ঃ মানস কুমার বড়ুয়া
সহযোগী সম্পাদক ঃ সুমন কান্তি নাগ
যোগাযোগ ঃ
ই-মেল ঃ sangramihatiar@gmail.com
ওয়েবসাইট ঃ www.statecoord.org
রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষে অজয় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ১০-এ শাঁখারীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৪, হইতে প্রকাশিত।